বাংলার পাহাড়ে নয়া সমীকরণ: দিন কি বদলাবে পাহাড়িদের

এখন ডুয়ার্স

১৬-৩০ এপ্রিল ২০১৭। ১২ টাকা

চা-বাগানে চাই কড়া সরকারি অনুশাসন

পাঠকের ক্যামেরায় জয়গাঁর বিপন্ন তোর্সা

মহিলারা দল বেঁধে গ্রামের চেহারা পাল্টে দিতে পারে!

৪র্থ বর্ষে পদার্পন

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের জীবনকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিয়েছে, কিন্তু তার সাথে অনেক অসুখও এনে দিয়েছে।
তার মধ্যে **কোষ্ঠকাঠিন্য** অন্যতম.................

কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে ৪ টি টিপস্ ঃ-

১. প্রচুর জল খান, প্রতিদিন অন্তত ৩ লিটার।

২. দৈনন্দিন খাবারে ফাইবারযুক্ত খাবারের মাত্রা বাড়ান।

৩. মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।

৪. রোজ অন্তত ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করুন।

Issued for the public interest by **Pharmakraft**

From the makers of :

PICOME Susp.

শীত কি শেষ অব্দি এবারের মত ডুয়ার্সের মায়া ত্যাগ করল?

সম্পাদকের ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের বাসিন্দাদের কাছে এতো নতুন কিছু নয়! তবুও তা চিরকালই রোমাঞ্চিত হওয়ার বিষয়। এবারও তার পুনরাবৃত্তি হল কেবলমাত্র। ফাগুনের আগুনে হাওয়ায় বাংলার দক্ষিণ ভাগের মাঠঘাট যখন পলাশের লাল দখল করে ফেলেছে, বসন্তের আবীরে রাঙা হয়ে উদ্‌বাহু নৃত্য করতে ব্যস্ত উদ্দাম যৌবন, রাতভোর কয়েক পশলা বৃষ্টিতে ডুয়ার্সের হোলির সকালে তখন জব্বর হিমের পরশ। মাইকে মাইকে বাজছে ঠিকই 'স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল' কিন্তু চাদরের ভেতর থেকে হাত বের করতে ইচ্ছে করছে না যে! সোয়েটার-জ্যাকেট খুলে রং খেলতে উৎসাহ নেই যে কারুরই! কী করবে, পরিবেশই তো 'পারমিট' করছে না! এমন হিমেল হোলি নাকি বহুবছর বাদে পেল ডুয়ার্সের মানুষ! অন্তত পাড়ার বুড়োদের তো ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সেইরকম অভিমতই পেশ করতে শোনা গেল এইবার। সকাল সন্ধে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে, শোনা যাচ্ছে কাছাকাছি পাহাড়ে বরফ পড়ছে অসময়ে, কাগজের পাতায় মিলছে সান্দাকফুতে শ্বেতশুভ্র বরফের গালিচা চিত্র। পর্যটকের দল সব ফেলে ছুটে আসছে উত্তরবঙ্গে, হঠাৎ করেই ট্রেনে-প্লেনে টিকিটের আকাল। শীত নয়, বসন্তের বরফ বলে কথা!

ডুয়ার্সের শীত কিন্তু তারপরও রয়ে গেল আরও বেশ কিছুদিন! ক্যালেন্ডার দেখে যাঁরা লেপ-কম্বল গুটিয়ে ফেলেন প্রত্যেকবার, তাঁরাও সব কাঁপতে কাঁপতে উচ্চারণ করলেন স্থানীয় প্রচলিত প্রবাদ, চত্তির মাসের শীতে হালের গরু ব্যাচে লেপ কাঁথা কে না খায় রে ভাই! সত্যি কথা বলতেকী, প্রকৃতির খেয়ালে বাংলার দক্ষিণে এপ্রিল-মে মাসে যখন দাবদাহ চলে, রাস্তার পিচ আর মাথার ঘিলু গলতে থাকে একই সঙ্গে, প্রখর দুপুরে শুনশান রাস্তায় হাঁটাচলা করতে ভয় পায় সাধারণ মানুষ, উত্তরে তখন সকালের মিঠে নরম হাওয়ায় রোদ পোহায় 'রাজ্যের পিছিয়ে পড়া এলাকার' জনগণ। কখনও কখনও দুপুরে রোদের ভ্রূকুটি তে জল ঢেলে দেয় সন্ধের টুকিটাকি কালবৈশাখি, পরিবেশ আবার শীতল হয়ে ওঠে আগের মতই। চায়ের কাপের তলানিতে পড়ে থাকা শীতের যাব যাব করেও যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

আর সেইসব কারণেই বোধহয় এবারের চৈত্র সেলও তেমন জমে ওঠে নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, আসলে আবহাওয়া 'কুল কুল' চলতে থাকায় অন্যান্যবারের মত গরমে পরার পোশাকের অভাব অনুভূত হয়েছে তুলনায় কম। উপরন্তু বৃষ্টি ভেজা সন্ধেয় বেশিরভাগ দিনই খদ্দেরের আনাগোনা ও কেনাকাটা ব্যাহত হয়েছে অনেকটাই। কিঞ্চিৎ হতাশ দোকানি তাই মনে মনে হয়ত প্রার্থনা করেছেন ডুয়ার্সের এই পরিবর্ধিত শীতের সমাপ্তির জন্য। সেই প্রার্থনা সম্ভবত ওপরওয়ালার কানে গিয়েও পৌঁছেছে। ডুয়ার্সে পয়লা বৈশাখ আসবার হপ্তাখানেক আগে থেকেই হাওয়ায় হিম 'হাওয়া'। ঘামের দাপাদাপি না শুরু হলেও গ্রীষ্মের রং ধরতে লেগেছে পোশাক- আশাকে, গাছের পাতায়। সেদিন এক ভাতের হোটেলে এক খাদ্যপ্রেমীকে আক্ষেপ করতে শোনা গেল, বৈশাখ পড়তে চলল তবু টকডাল-তেতোডাল খাওয়া হল না এখনও! পাল্টা উত্তরও মিলল পাশ থেকে, অ্যাত্তো তাড়াতাড়ি ওসব ভাববার কিছু নেই দাদা, কয়েকটা দিন এরকম যেতে দিন, তারপর একদিন এমন ঢালবে যে তখন মনে হবে 'ন্যাচারাল এয়ার কন্ডিশনার' চালু হয়ে গিয়েছে!

সে যা হওয়ার হোক গে! আমরা বলি কি বছরের শেষ আর শুরুর কটা দিন প্রথা আর পাঁজি মেনে একটু উষ্ণতাই বোধহয় কাম্য ছিল সকলের! কারণ শৈত্যের অবসান যে সকলের জন্যই মঙ্গলবার্তা বয়ে আনবার প্রতীক। শীতের পরশ আসলে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখে দিনভর, আমরা টের পাই না সেই সুযোগে দুস্কৃতীরা চুরি করে নিয়ে যায় আমাদের ধন মান, সারল্য, আমাদের পুত্রকন্যা, কণ্ঠস্বর, আমাদের অরণ্য ও সত্বাকে। আমরা মূঢ় মূক হয়ে বসে থাকি বছরের পর বছর। অতএব ভায়া, অনেক হয়েছে, আর শীত নয়, বাংলা নববর্ষে এক নবীন গ্রীষ্মের প্রতীক্ষায় রইলাম আমরা ডুয়ার্সের মানুষ।

চতুর্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৬-৩০ এপ্রিল ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৩
উত্তরপক্ষ ২০
মহিলাদের স্বনির্ভর দলগুলি গ্রামের চেহারা পাল্টে দিতে পারে!
চায়ের ডুয়ার্স, ডুয়ার্সের চা ৮
শত সমস্যায় জর্জরিত চা-বাগানগুলোতে চাই কড়া সরকারি গাইড লাইন ও অনুশাসন
প্রচ্ছদ নিবন্ধ ১৪
পাহাড়ে রাজনীতির নয়া সমীকরণ দিন কি বদলাবে পাহাড়িদের?
পাঠকের ক্যামেরায় ১৮
পূর্ব ডুয়ার্সের দুই ঠিকানা
পর্যটকের ডুয়ার্স ২২
পূর্ব ডুয়ার্সের দুই ঠিকানা
ডুয়ার্স তরাই শতাব্দী এক্সপ্রেস ৩০
শতাধিক বছরের 'সমাজ' আর্যনাট্য
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ৪২
গরমকালে ছানি অপারেশন করুন নিশ্চিন্তে
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৪
লাল চন্দন নীল ছবি ৩৩
তরাই উৎরাই ৩৬
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩
শ্রীমতী ডুয়ার্স
আজকের শ্রীমতী ২৭
ডুয়ার্সের ডিশ ২৭
নিয়মিত বিভাগ
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ২৯
খুচরো ডুয়ার্স ৪
ডুয়ার্সের ডায়েরি ৬
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩৯
চার বাংলোর গান জার্নি

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস,
প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বোল্ড

সমস্যার কি আর শেষ আছে রে ভাই! এদ্দিন তিস্তা-বালাসনের বোল্ডারের দাম বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা দিচ্ছিল টনপিছু সাড়ে তেরো ডলার। এখন নাকি মালয়েশিয়া-মায়ানমারের বোল্ডারওয়ালারা তাদের বলেছে, অত্ত দাম দিয়ে পাথর কিনে কী লাভ ব্রাদার! আমরা সস্তায় বোল্ডার থ্রো করে দিচ্ছি তোমাদের দেশে। এতে তোমাদের শোলডারে চাপ অনেক কম পড়বে। ফলে এ দেশের বোল্ডারবাবুদের মাথায় হাত! কিছুতেই টনপিছু দশ ডলারের বেশি দিতে রাজি নয় ওই বাংলা। সারি সারি বোল্ডার বোঝাই ট্রাক ফুলবাড়ি সীমান্তে কয়েক মাইল লম্বা লাইন বানিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক টন বোল্ডার ওপারে পাঠাতে খচ্চা প্রায় সাতশো টাকা। দশ ডলারে কি পোষায় রে চাচা! তবে? কী জানি কী হবে! ভরসা একটাই যে বোল্ডার পচে না।

গতি গণিত

হুঁ হুঁ বাবা! ষাট মিনিটে চল্লিশ কিলোমিটার গেলে আট কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে? লাটাগুড়ি আর চালসায় ক্যামেরা বসিয়ে দেখা হবে সেই সময়। মাঝে আট কিলোমিটার জঙ্গল পার হতে গাড়ি ক'মিনিট নিচ্ছে, তা হিসেব করলেই বোঝা যাবে গাড়ির স্পিড। চল্লিশ পেরলেই গ্রেপ্তার! আসলে ওই আট কিলোমিটার পার হতে বারো মিনিটের কম সময় মানেই গাড়ির স্পিড বিপজ্জনক। চল্লিশের লক্ষ্মণরেখাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অলপ্পেয়ে চালকরা যে হারে জঙ্গলের রাস্তায় গতির ঝড় তুলছে, তাতে হামেশাই রাস্তা পার হতে গিয়ে পরপারে চলে যাচ্ছে চিতা-বাইসন-বাঁদর-সাপেরা। এদ্দিন বিস্তর চেষ্টা করেও গতিবাজদের মতি ফেরানো যায়নি। তাই এই ব্যবস্থা। বিজ্ঞজনেরা অবশ্যি বলছেন যে, এতেও কাজ না হলে গোরুমারার বাঁদরকুলকে ট্রেনিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত। গতিশীল ড্রাইভারের গালে চড়-থাপ্পড় কষিয়ে তারাই নাকি ঠিকঠাক রাখতে পারবে স্পিড লিমিট।

বিনয়ানন্ত

ডুয়ার্সের বাইসনরা কেন লোকালয়ে মুখ দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তা নিয়ে কী তরজা বিনয়-অনন্তের! অনন্তের দাবি, বাম-আমলে নাকি জঙ্গলে ছেড়ে বাইরে আসতেই চাইত না বাইসনবাবুরা। জঙ্গলে সে সময় নাকি নিয়মিত ঘাস লাগানো হত। সেই কমরেডমার্কা তৃণ এত্ত এত্ত ফলত যে রীতিমতো হোমসিক, থুড়ি, ফরেস্টসিক হয়ে পড়ত তারা। এখন ঘাসফুল কোম্পানি ঘাস লাগায় না বলেই তো বাইসনদের এত বাইরে আসার বাই। শুনে বিনয় নাকি বলেছেন, বাজে কথা! নদীচরে সদ্য গজানো কুশ খেতে বাইসনভাইরা খুব পছন্দ করে বলেই সেসব খেতে গিয়ে পথ ভুলে লোকালয়ে হাজির হচ্ছে। পাবলিক অবশ্য বলছে, বাইসনরা তো অনেকদিন ধরেই গেরস্তের পাড়ায় আসছে। এর মধ্যে ডান-বামের কোনও ব্যাপার নেই। ঠিকই তো! বাইসনরা কি বিজেপি না বামপন্থী, যে দিদিভাইকে বিড়ম্বনায় ফেলতে পঞ্চায়েতে হানা দেবে?

খাসি খবর

বালুরঘাটের কাছেই অযোধ্যা গ্রাম। সেখানে এক গেরস্তের দুই খাসি। নাম লালু-ভুলু। তা লালুর ওজন কিলো পনেরো হওয়ায় গেরস্ত তাকে হাটে নিয়ে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত

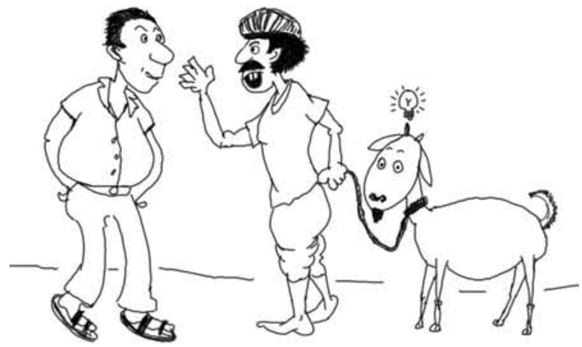

নিলেন। সে নিয়ে বাড়িতে যখন সম্ভাব্য ক্রেতার সঙ্গে আলোচনা চলছে, তখন লালুর মাথায় হাজার ওয়াটের ল্যাম্প জ্বলে উঠল। গম্ভীর মুখে পাতা চিবানো ছেড়ে গুটিগুটি পায়ে ঢুকে গেল গেরস্তের সদ্য তৈরি ঝাঁ-চকচকে পাকা ঘরে। শিং দিয়ে ঠেলা দিতেই রঙের গন্ধ-মাখা দরজা গেল বন্ধ হয়ে এবং, কী বলব কাকা— দরজায় খিলও লেগে গেল। সাধের নতুন ঘরে নতুন দরজা ভেঙে লালুকে বার করে আনতে কিছুতেই মন চায় না গেরস্তের! ফলে শুরু হল হুলুস্থুলু! অনেক কাণ্ড করে, ঘুলঘুলির ইট সরিয়ে ফোকর তৈরি করে, সেখান দিয়ে এক বাচ্চাকে ঢুকিয়ে শেষে খিল আর দরজা খোলা সম্ভব হয়েছে। অভিমানী খাসিকে আর বেচবেন না বলে ঠিক করে ফেলেছেন গেরস্ত। এর পর যদি শৌচাগারে ঢুকে খিল দেয়, তবে?

বাজেটাতঙ্ক

জলপাইগুড়ি পুরসভার বাজেট শোনার পর বিরোধী কাউন্সিলারদের কেউ খাবি খেয়েছেন, কেউ 'জীবন অসার' বলে হিমালয়ের টিকিট কেটেছেন, কেউ বালিশের পাশে ফ্রিজ খুলে রেখে ঘুমাচ্ছেন মাথা ঠান্ডা করার জন্য! বাজেটের পরিমাণ পাঁচশো ছাব্বিশ কোটি! দেড় লাখ লোকের পুরসভার বাজেট শুনে জেলা পরিষদের লোকেরাও নাকি ঘুমের ঘোরে চমকে উঠছেন! কারণ তাঁদের বাজেটের বারো গুণ হল ওই পাঁচশো ছাব্বিশ। কর আদায়ের পরিমাণ প্রায় ছ'গুণ বাড়বে শুনে বিরোধীরা বাক্যহারা! ফ্লাইওভার থেকে শুরু করে ন্যাশনাল পার্ক পর্যন্ত বাজেটের তালিকায়! কেবল যুদ্ধবিমানটাই নাকি বাদ পড়েছে। তবে শাসকদল অবশ্যি জানিয়েছে যে, এমন বাস্তব বাজেট আর হয়নি। শুনে কোনও এক বিরোধী মুচকি হেসে নাকি বলেছেন, বেশি স্বপ্ন দেখলে সেটা দুঃস্বপ্ন হয়ে যায়।

জাপানি শিং

মানে, উক্ত দেশের বিখ্যাত তৈল, যাহার

কোথায় গেলি

নেওড়ার জঙ্গলে বাঘমামার খবর পাওয়ার পর সেখানে দু'গন্ডা ক্যামেরা বসিয়েছিলেন বনবাবুরা। তার মধ্যে একটা ভ্যানিশ! কী আশ্চর্য! যে ক্যামেরা লোকের চোখে পড়ার কথা নয় তা ভ্যানিশ হল কীভাবে? বাঘেরা সেল্‌ফি তোলার জন্য নিয়ে যায়নি তো? প্রচুর খোঁজাখুঁজি করেও উদ্ধার হয়নি সে যন্তর। তাহলে কি বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা আছে নেওড়া ভ্যালির জঙ্গলে? ক্যামেরার মতো বাঘুরাও ভ্যানিশ হবে না তো? খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে রে ভাই! ওরে ক্যামেরা! তুই কোথায় গেলি? তোকে কি বাঘেরা কোথাও সেট করেছে নিষিদ্ধ জঙ্গলে মানুষের ছবি তোলার জন্য? উত্তর দে!

বিহনে লিঙ্গ ঘুমাইয়া রইল! তবে তেল নয়, খেল নাকি শিংবাবাজিও দেখাচ্ছিল। সে আবার যে-সে শিং নয় বাপু! এক্কেবারে গন্ডারের খড়্গ। মালদা থেকে কোবরেজ এসে সেই শিং কিনে নিয়ে যেত চড়া দামে ডুয়ার্স থেকে। শিংচূর্ণজাত ওষুধ খেলেই শরীরের বিশেষ অঙ্গে গন্ডারের তেজ! দিব্যি চলছিল কারবার। কিন্তু তক্কে তক্কে ছিলেন এসএসবি আর বন দপ্তর। সাড়ে চারশো গ্রাম ওজনের শিং নিয়ে কোবরেজমশাই বানারহাটে আসতেই এক্কেবারে খপাৎ! জানা গেল, শিং নয়— তিনি তক্ষকও কিনতেন জবরদস্ত ক্যাপসুল বানাবার জন্য। আপাতত মক্কেল শ্রীঘরে বিরাজ করছেন। যৌন বিষয় ছেড়ে মৌন হয়ে গিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।

মেঘলাল

আহা! কী দুঃখ মেঘলালের! এদ্দিন ডুয়ার্সের জঙ্গলে ভাই-বেরাদরদের গোনার কাজে সে ছিল নেতা। কিন্তু এ বছর গণনার কাজে প্রায় চার ডজন কুনকিকে কাজে লাগানো হলেও মেঘলাল বাদ। সে যে রিটায়ার করেছে! ওদিকে কুনকিদের জঙ্গলে গণনার কাজে যেতে দেখে তাদের ছানাপোনারা শুঁড় তুলে এমন হুল্লোড় জুড়ে দিয়েছে যে, বাধ্য হয়ে তাদেরও নিতে হচ্ছে সঙ্গে দুধ-ভাত হিসেবে। আবার ডজনখানেক ছানা সামলাতে কুনকিরাও পড়েছে ফ্যাসাদে। ইয়ার-দোস্তদের গুনবে, না ছানা সামলাবে? সব মিলিয়ে তিন দিনের হাতি গোনার কারণে ডুয়ার্সে ধুন্ধুমার লেগে গিয়েছিল। মেঘলাল অবশ্যি একা একাই রিটায়ার্ড লাইফ কাটাচ্ছে মেদলার জঙ্গলে, জলঢাকার পাড়ে। কবিতাও লিখছে। ছানা হাতিরা বেশি বাঁদরামি করলে তাকে ডাকা হবে। হাতিদের পাঠশালায় তিনি কড়া হেড়ু কিনা!

টুক্রাণু

তিস্তাপারে ভয়ানক অজানা জন্তুর আগমন এবং সে অধরা। ডুয়ার্স সফরে 'কন্যাসাথী'র থিম সং লিখে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী। মাঝচৈত্রে শীত ফিরে এল ডুয়ার্সে। বেশ ক'দিন বন্ধ থাকার পর তালমায় খুলল, চা-বাগান নয়, দেশি মদের কারখানা। মহকুমা হল মিরিক, ফলে মোর্চা থেকে তৃণ হওয়ার হিড়িক। শিলিগুড়িতে ভাজপা নেতার হোয়াট্‌সঅ্যাপ হ্যাক। কারা জানি প্রাক্তন পর্যটন কর্তাকে ফোন করে কল গার্ল চাইছে, শিলিগুড়িতে। সামসিতে হাটের জমি দখলের জন্য নেতাদের প্রতিযোগিতা। রায়গঞ্জের কিষান মান্ডি বছর ঘুরতেই মুখ থুবড়ে ঠান্ডি। চোরাই কাঠ চেরাইতে অভূতপূর্ব দক্ষতা দেখাচ্ছে ইসলামপুর। গয়াবাড়িতে গ্রেপ্তার পনেরো ফুটি কিং কোবরা।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬-৮৩৯৮৮
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

পয়লা বোশেকের নকশা

পয়লা বোশেক বলে কতা। ডুয়ার্স জুড়ে শুরু হয়েচে বচ্ছরকার রঙিন উৎসব। চাদ্দিকে হাহাহিহিহোহো ক্যালরব্যালর ফাংশান চলচে। নবোবরষো উদ্‌যাপনের উল্লাসের যেন আর শেষ নেই। এক মাস ধরে পাড়ার মোড়ে মোড়ে পয়লা বোশেকের আইটেম ঢালাও বিক্কিরি হচ্চে। খেঁকুরে মিনসেরা গলার রগ ফুলিয়ে একটানা চিল্লে যাচ্চে— সেলসেলসেল! নামী বুটিকের মালকিন গাঁ-গঞ্জ উজাড় করে নবসাক্ষর ফিমেলদের ধরে এনেচে। মহিলাম্যাজিক স্বনির্ভর প্রোজেক্ট। কুর্তা, কুর্তি, পাঞ্জাবি, গেঞ্জি, পাতলুনের ওপর ত্যারাব্যাঁকা ফন্টে অআকখ থেকে ংঃঁ পর্যন্ত কী কী সব লেকা। মনে হয় রবিন্দোনাথের আর জীবনানন্দোর পোদ্য লিকেচে। বুটিকের মালকিন স্লিভলেস পরে হাসি-হাসি মুকে ঘুরচে, নমোস্কার করচে সবাইকে, কিন্তু কুটোটি নাড়চে না।

পয়লা বোশেকের ডিমান্ডের কতা মাতায় রেকে বড় বড় রাস্তায় বড় বড় স্টল হচ্চে। আইটেম গার্লরা সং সেজে স্টলে স্টলে পয়লার আইটেম বিক্কিরি করচে। যাদের রেস্ত কম, তাদের জন্য এক ফালি ন্যাকড়ার ওপর শুদু লেকা 'আ মরি'। সঙ্গে বাংলা গানের সিডি, বাংলা পানুর ডিভিডি, বাংলা মদ, বাংলা কামশাস্ত্র (সচিত্র), সাত দিনে বাংলায় কম্পিউটার শিক্ষার (হার্ডওয়্যার) ও মোবাইল রিপেয়ারিং-এর বই হইহই করে বিকোচ্চে। জনগণ হামলে পড়েচে। এমন ভিড় য্যানো কাঁটালের ভুতিতে ডুমো ডুমো মাচি বসেচে।

পয়লার আগের রোব্বার ডুয়ার্সের সমস্ত শহরে বড় বড় গুলজার থাকে। সবাই সে দিন হেব্বি মুডে। পানের খিলির দোকানে বেল ফুলের মালার মতো গুটকার প্যাকেট ঝুলচে। প্যাকেটে পচা ফুসফুসের আবচা ছবি। ওসব আজকাল কেউ পাত্তা দেয় না। পাব্লিক আকাশের দিকে তাকিয়ে মুকে গুটকা উজাড় করে দিচ্ছে। তারপর 'এখানে ময়লা আবর্জনা ফেলিবেন না'-র ওপর পিচিক করে থুতু ফেলে হ্যা হ্যা করে হাসচে। এম্নি এম্নিই হাসচে। পাহাড় হাসচে, জঙ্গল হাসচে যখন, তখন ডুয়ার্সের পাব্লিক খামোকা গোমড়া থাকতে যাবে ক্যানো!

ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে গুটকার গন্ধ ভুরভুর করে বেরিয়ে য্যানো শহর মাতিয়ে তুলচে। পঞ্চায়েত ভোট এক বচ্ছর বাদে, কিন্তু সামনেই কয়েকটা পুরসভার ভোট আছে। তার টেম্পো তৈরি করতে লিডাররা মাইকে ফাটিয়ে লম্বাচওড়া বক্তিমে দিচ্চে। লিডাররা বলচে, চাদ্দিক থেকে ঘিরে ধরে লাইফ হেল করে দিন, জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলুন, চোক গেলে দিন...। পাব্লিক উদ্দাম ক্ল্যাপ দিচ্চে। কারও কারও বডিতে প্রচুর অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ হচ্চে, মন টগবগ করচে তুরীয় আনন্দে, কিন্তু পাব্লিকলি এসব শো করতে নেই, তাই গোমড়া মুখে মাতা নাড়িয়ে বলচেন, ছি ছি ছি, কী জমানা পড়েচে রে বাবা! রাজনৈতিক শিষ্টাচার তো দেকচি ভুলে গ্যাচে সবাই। আমাদের সময়...। ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ আবার মোবাইলে এসব গরমাগরম বক্তিমে সেভ করে রাকচে। হোয়াটস্যাপে খপরের চ্যানেলকে সাপ্লাই দিয়ে পরে রগড় দেকবে বলে।

সমর ভেকেশন আসব আসব করচে। বাবু-বিবিরা তকন গণহারে পাহাড়ে পালাবে বলে ঠিক করে রেকেচে। রেলের রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে না। 'গণহারে' বলতে গিয়ে মনে হল, 'গণ' শব্দটা আজকাল খুব হিট করেচে। গণধর্ষণ, গণপিটুনি, গণ-আন্দোলন— এসব হচ্চে খুব। এগুলির ভিডিয়ো ক্লিপিংস তুলে ইউটিউবে দিতে পারলেই হিট আর লাইকের জোয়ার বইচে। মিডিয়াও এসব দেকিয়ে ফাটিয়ে দিচ্চে। বাঙালি টিভি অ্যাঙ্কররা কোট-টাই-পাতলুনে সেজেগুজে পুরনো সব ঘোটালার মন্তাজ বানিয়ে ঢং করে বলচে— এই অ্যাক নতুন...!

সন্ধ্যা নামলেই হাফনেতা, ফুল-শয়তান, পৌনে প্রফেসর, সিকি-সোশ্যাল অ্যাকটিভিস্টরা স্নো পাউডার, পমেটম, রুজ মেখে চ্যানেলে চ্যানেলে ডিসকাশনে নামচে। পায়ে পা লাগিয়ে অ্যাকে অপরের ঘাড়ে-কোলে উটে গণখেউড় করচে। বারমুখো মিনসেরা আজকাল আর বারে গিয়ে নেশা করে না। করবেই বা কেন? লুঙ্গি পরে শসা-মুড়ি খেতে খেতে হোমথ্যাটারে গণখেউড় দেখেই তো তুরীয় মৌতাত হচ্চে।

দেখতে দেখতে নবোবরষো চলে এল। গত এক মাস ধরে এক কাঁড়ি নিউজ চ্যানেল আর নিউজপেপারের কুহু কুহু কলতানে মনে হচ্চে চিরবসন্ত এসে গ্যাচে। সিরিয়াল শাশুড়ি, বুড়ি হিরোইন, আইব্যাগওয়ালা আইবুড়ো নায়ক, ঝিঙ্কু মামণি ও স্পটবয়রা লাইন করে এসে ভিড় জমালেন চ্যানেলে চ্যানেলে। পাব্লিক মহা আনন্দ করে তাঁদের রঙ্গরসিকতা দেকলেন। বেওয়ারিশ লুচির ময়দা বা তৈরি কাদা পেলে নিষ্কর্মা মাত্র যেমন করে একটা পুতুল বানিয়ে খ্যালা করে, তেমনই বাঙালি জাতি নিজের রাজ্যিটাকে নিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে টাল খাইয়ে তামাশা দেকতে দেকতেই একটা বছর পার করে দিল। নোতুন বর্ষ উৎসব এবারের মতো খতম হল।

হুতোমপ্যাঁচাকে নববর্ষ নিয়ে নকশা লিখতে বলা হলে এমন কিছুই হয়ত লিখতেন। পয়লা বৈশাখ নিয়েই তো শুরু হয় উৎসবমুখর বাঙালির বচ্ছরকার উৎসব। পয়লা বৈশাখ নিয়ে কিছু বলা হবে আর পাঁজি নিয়ে কিছু শব্দ খরচ করা হবে না, এমন হতে পারে না। আসলে এ হল বাংলার সর্বকালের বেস্টসেলার। ফি-বছর হালখাতা আর বাঙালিয়ানার শুরু যেন এর হাত ধরেই। ভাঁড়ারঘর বা কুলুঙ্গিতে নিদেনপক্ষে খাটের নিচে রাখা সিন্দুকে কোনও এক কোনায় এর দেখা মিলবেই।

পাঁজি আপামর বাঙালি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। বাঙালি সংস্কৃতির রূপ-রস, সংস্কার, ভাবনার চলমান ইতিহাস হল পঞ্জিকা। বাঙালির আদরের পাঁজি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গতরে পালটেছে। বাজারে এখন হাফ, ফুল, পকেট— সবই মিলবে। কিন্তু গায়ে-গত্তিতে এখনও সেম সেম। সেই জ্যালজেলে গোলাপি পাতায় রাশিচক্রের ছবি দেওয়া প্রচ্ছদ। ততোধিক ফিনফিনে পাতায় ছাপা এখনও অপরিবর্তনীয় পাঁজির কদর কিন্তু কমেনি। বরং বেড়েছে। শপিং মলেও আজকাল পাঁজি বিক্রি হয়। সিডি-ও আছে। ২০০৭ সালে গুপ্তপ্রেস বার করে প্রথম। আজকাল নেট যুগে মাউস ছোঁয়ালেই নানা কোম্পানির, নানা জাতির পাঁজির হালহদিশ হাজির। গুপ্তপ্রেসের পাঁজি রীতিমতো বিদেশ যায় সসম্মানে। অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর,

ইথিওপিয়া, জোহানেসবার্গ, রাশিয়া, সুইডেন— কোথায় নয়! খোদ লন্ডনেও যায় সে। পাঁজির সঙ্গে বাঙালির নাড়ির টান। না হলে কলকাতায় ছাপা পঞ্জিকায় লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্কের সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সময় কেন থাকে?

পঞ্জিকা আম-বাঙালির গৃহস্থালিতে রোজকার আচার-বিচার, পুজোপার্বণ থেকে জন্মমৃত্যু পর্যন্ত এক অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। পঞ্জি শব্দের অর্থ তালিকা হলেও পঞ্জিকা হয়ে উঠেছে ধর্মাশ্রয়ী কার্যবিধির এক বিশেষ তালিকাসমৃদ্ধ গাইড বুক। চলতি কথায় পাঁজি, যা বছরের প্রথমে দৈবজ্ঞের কাছ থেকে শোনাই ছিল প্রচলিত রীতি। কোনও এক দৈবজ্ঞ বলেছেন, বারো হরতি দুঃস্বপ্ন নক্ষত্রং পাপনাশনং। তিমির্ভবতি গঙ্গায়া যোগঃ সাগরসঙ্গমঃ/ করনাং সর্বতীর্থানি শ্রায়ন্তে দিন পঞ্জিকা। বার, নক্ষত্র, তিথি, করণ, যোগ— সবকিছুর হদিশ মিলবে এতে। পঞ্চ অঙ্গবিশিষ্ট এই প্রচেষ্টাকে সংস্কৃত সাহিত্য কিংবা অন্য প্রদেশে বলা হয়েছে পঞ্চাঙ্গ। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ভর করে গণিতবিদ্যায় আধারিত সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের এ এক দণ্ড, পল কিংবা বিপলের নিখুঁত এক সংবাদমাধ্যম, যার থেকে অবধারিতভাবে গড়ে উঠেছে বিচিত্র ও বহুমুখী সংস্কার।

পাঁজি লোকে পড়ে না, দেখে। আমিও অক্ষরপরিচয় হওয়ার আগে থেকেই বাড়িতে সে জিনিস দেখে আসছি। গোলাপি রঙের মলাটের মধ্যস্থলে গোঁফহীন অথচ গম্ভীর এক ব্যক্তির মুখের ছবি, সেই মুখের চারপাশে বারো গ্রহরাশির ছবি। তবে পড়তে শেখার পরেও পাঁজির মধ্যে যে জিনিস আমাকে সবচাইতে বেশি টানত তা হল বিজ্ঞাপন। পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া সময়ের পাঁজি দেখে আঁচ করা যায় সে আমলের বাঙালির রুচি, চাহিদা, জীবনযাপনের ধরন।

পাঁজিতে বীজ-সার, 'বৃহৎ লাল মুলা' বিজ্ঞাপন যেমন পাওয়া যায়, তেমনই গ্রামীণ পালপার্বণের দিনক্ষণও দাগানো থাকে। কিন্তু সব মিলিয়ে মনে হয়, পাঁজির প্রধান টার্গেট শহরের নিম্নমধ্যবিত্ত, বিশেষ করে পুরুষসমাজ। 'সচিত্র বিলাতী গুপ্তকথা' বা 'রতিমঞ্জরী' তো তারাই পড়বে। 'রতিবর্দ্ধক রসায়ন' আর 'রতিকান্ত বটিকা'র নিদান তো তাদের বলবীর্য বাড়ানোর জন্যই। এমনকি কুন্তলবাহার, কেতকীকুসুম, গোলাপকুসুম— গন্ধতেলে একেবারে মাখামাখি হলুদ পৃষ্ঠাগুলোও তো 'মেসেজ' পাঠাচ্ছে পুরুষকেই। এইসব গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করলেই আপনার ভার্যা বা প্রিয়া তিলোত্তমা হয়ে উঠবেন। চুড়ি-বালার বিজ্ঞাপনও থাকে, আর নারীর গুপ্তরোগের সমাধান নিয়ে আসে 'প্রদরারি বটি'।

আসলে পাঠকসমাজ মানে কোনও এক ধরনের গোল গোল সমাজ নয়, তার মধ্যে নানা ভাঁজ থাকে। ধাপ থাকে। কেউ হয়ত বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ পড়েন, আবার বটতলার বইও উলটে দেখেন। কারও কাছে হয়ত গুপ্তকথাই একমাত্র পাঠ্য। 'বিষবৃক্ষ' বা 'চন্দ্রশেখর' পড়ে যিনি বড় হয়েছেন, সেই জ্যোতির্ময়ীদেবীরও পড়া ছিল উদাসিনী

১৯২৯ সালের পাঁজির বিজ্ঞাপন দেখলে মনে হবে, ধাতুদৌর্বল্য, শীঘ্রপতন আর যৌনরোগের কবলে পড়ে বাঙালি পুরুষ যেন ধ্বজভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। নানাবিধ 'গোপন' সমস্যায় নারীরা বড়ই কাতর। অথচ ওই সময়েই ফুটবলে ময়দান দাপাচ্ছেন ছোনে মজুমদার আর বাঘা সোমের দল।

রাজকন্যার গল্পটা। ১৮৮৭ সালে 'দেড়ে বাবাজী' ছদ্মনামে কোনও একজনের লেখা ওই বইটা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর মন্দিরেও স্থান পেয়েছিল।

ওষুধবিসুধের বেলায় হিসেবটা একটু অন্যরকম। ডি গুপ্তর কুইনাইন ছেড়ে বংশীধর আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ের 'শিবশক্তি বটিকা' সেবন করত কোন বাঙালি? এটা ঠিক, যে পেনিসিলিনের নাম তখন জানা ছিল না। অর্শ বা যৌনরোগের জন্য লোকে কবিরাজি আর চাঁদসির চিকিৎসা করাত। তাতেও না হলে ছুটতে হত ডাক্তারের কাছে। কোনও পাশ করা ডাক্তারবাবু কি নবশক্তি ঔষধালয়ের 'শক্তিসিন্দুরসায়ন' বা 'গণোডাইন' প্রেসক্রাইব করতেন? মুমূর্ষু রোগীর দেহে প্রয়োগ করতেন 'ইলেকট্রিক সলিউসন'? গার্ডেন রিচের ডাঃ ডি ডি হাজরা পরিবেশিত ওই অব্যর্থ সলিউশনটির বিজ্ঞাপন কিন্তু পুরনো পাঁজি খুঁজলেই পাওয়া যায়। আজও ট্রেনে-বাসে ওষুধ কেনাবেচা হয়। মনে হয়, ভাগাভাগি একটা ছিলই। আজও আছে। সেটাই ঠিকরে পড়ে বিজ্ঞাপন দেখলে, পাঁজি ঘাঁটলে।

১৯২৯ সালের পাঁজির বিজ্ঞাপন দেখলে মনে হবে, ধাতুদৌর্বল্য, শীঘ্রপতন আর যৌনরোগের কবলে পড়ে বাঙালি পুরুষ যেন ধ্বজভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। নানাবিধ 'গোপন' সমস্যায় নারীরা বড়ই কাতর। অথচ ওই সময়েই ফুটবলে ময়দান দাপাচ্ছেন ছোনে মজুমদার আর বাঘা সোমের দল। ছাত্রীদের নিয়ে সংগঠন করছেন ঢাকায় লীলা নাগ, কলকাতায় কল্যাণী দাস। মেছো বাজার তল্লাশ করে পুলিশ খুঁজে পেয়েছে রাজদ্রোহের চক্রান্ত। অমর শহিদ যতীন দাসের দেহ নিয়ে রাস্তায় নামলেন পাঁচ লক্ষ মানুষ। বারান্দা থেকে ফুল ছড়িয়ে দিলেন নারীরা। এ-ও তো একটা সময়। কিন্তু পাঁজির বিজ্ঞাপনে যে জগৎটা ধরা পড়ে, তার জ্যামিতি কিঞ্চিৎ আলাদা।

এর পর অনেক সময় কেটেছে, পৃথিবী দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো হয়েছে, জার্মানি জোড়া লেগেছে, দুই কোরিয়া ফুটবল খেলছে, ভোটারদের বয়স কমেছে। সর্বোপরি, এখন আর পঞ্জিকার পাতায় গ্রহের অবস্থান দেখে বৃষ্টি, খরা, মহামারি আন্দাজ করতে হয় না। কিন্তু পৃথিবী যতই এগিয়ে থাকুক, বাঙালির এখনও শুভ অনুষ্ঠানের দিন ঠিক করতে পঞ্জিকা ছাড়া চলে না। বিয়ে, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, সাধভক্ষণ তো বটেই, সন্তানের জন্ম তারিখ আর জন্ম সময় এখন ডাক্তারের সঙ্গে ঠিক করে নেওয়া যায়, তার আগে পঞ্জিকা দেখে নিতে হয় নির্দিষ্ট দিন বা সময়টা শুভ কি না।

দুর্গা পুজোর আগে এক লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা না বললে লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, মা দুর্গা কীসে করে আসছেন— গজে, দোলায়, না নৌকায়— সেটা লেখা থাকে পঞ্জিকায়। গত বছর দুর্গোৎসবের সময় আমার প্রতিবেশী কিশোর ছেলেটি বলেছিল, 'বুঝলে কাকু, এবার মা দুর্গা লরি করে আসছেন, আগের বার ম্যাটাডোরে করে আনতে আমাদের বড্ড অসুবিধে হয়েছিল!'

পুরুষ শ্রমিকেরা বাগান ছেড়ে পাড়ি জমাচ্ছে ভিন রাজ্যে। পরিবারের নারীরা তুলছে পাতি

শত সমস্যায় জর্জরিত চা-বাগানগুলোতে চাই কড়া সরকারি গাইড লাইন ও অনুশাসন

‘এখন ডুয়ার্স’-এর পক্ষ থেকে চায়ের ডুয়ার্সের কোণে কোণে ঘুরে তুলে আনা জ্বলজ্যান্ত ছবি পেশ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা** তাঁর ধারাবাহিক প্রতিবেদনের **চতুর্দশ পর্বে**।

চায়ের ডুয়ার্স ডুয়ার্সের চা

২০১৮-য় পঞ্চায়েত, ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচন। শুরু হয়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর, প্রশাসনে সাজো সাজো রব, লক্ষ্য উন্নয়ন দিয়ে সাংগঠনিক শক্তির বিস্তার, আশু লক্ষ্য বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত দখল করে শাসকগোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, যাতে ২০১৯-এর মূল লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হতে বেগ পেতে না হয়। বিরোধীরাও তৎপর শাসকগোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিন্ন করে হৃত সাংগঠনিক শক্তি পুনরুদ্ধার করতে, মজুরি বৃদ্ধির লড়াইকে আরও তীব্র করে বাগিচা শ্রমিকদের সমর্থন আদায় করতে। আদিবাসী বিকাশ পর্ষদের বিভিন্ন গোষ্ঠীও ভোট কাটাকাটির জেরে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছে, আর গজমুমু তো বাগিচা-বলয়ে এখন প্রতিষ্ঠিত শক্তি, যাদের কালচিনি, মাদারিহাট, বীরপাড়া ব্লকে জোরদার সংগঠন। উত্তরের চা-বলয়ে চা-বাগিচা নিয়ে আন্দোলনের শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাস আছে। এই আন্দোলনকে পরিচালনা করেছে কোনও না কোনও রাজনৈতিক দল বা শ্রমিক সংগঠন। আন্দোলনে ছিল মূলত বাগিচা শ্রমিক বা বাবুরা। কিন্তু ইতিমধ্যেই চা-বাগিচা নিয়ে চা-বাগান সংগ্রাম সমিতি গঠিত হয়েছে ডুয়ার্সে। পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছেন চঞ্চল দাস, খোকন দে, সুমন গোস্বামী, জ্যোতির্ময় রায়, শুভ্রজিৎ রায় প্রমুখ। সংগ্রাম সমিতির শুভাকাঙ্ক্ষীদের তালিকা ধরলে সংখ্যাটা খুব একটা ছোটখাটো কলেবরের নয় বললেই চলে। মালবাজার, কালচিনি, আলিপুরদুয়ারে ইতিমধ্যেই কমিটি গঠিত হয়েছে। সোনাদা, কালিম্পং, বানারহাট, নাগরাকাটা, জলপাইগুড়িতেও রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক-প্রগতিশীল এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে নতুন এই মঞ্চ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যেই ডুয়ার্সে এই মঞ্চের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। রাজ্যের সমাজকর্মীদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত মুখ সুমন গোস্বামী। এক একান্ত সাক্ষাৎকারে এই ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানালেন, উত্তরবঙ্গে পাহাড়-তরাই- ডুয়ার্স মিলে ২০টির কাছাকাছি বাগান অচল এবং বন্ধ। কোনও প্রকারেই মানাবাড়ি, রেড ব্যাঙ্ক, ধরণিপুর, সুরেন্দ্রনগর ইত্যাদি বাগিচাগুলো খুলছে না। বন্ধ চা-বাগিচাগুলোতে যে

সমস্যা, খোলা চা-বাগিচাগুলোতেও সমস্যা তার চেয়ে কম নয়। তবে না কেন্দ্র, না রাজ্য সরকার— কোনও সরকারই গত দুই-তিন দশক ধরে চা শ্রমিকদের সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করেনি, পাশে দাঁড়ায়নি শ্রমিকদের। ন্যূনতম মজুরির দাবিতে উত্তরবঙ্গে বন্‌ধে পর্যন্ত গিয়েছে চা শ্রমিকরা, আজ পর্যন্ত ন্যূনতম মজুরি চালু হয়নি। প্রতিটি বাগানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাস, পানীয় জলসহ হাজারো সমস্যা। অনাহার, অপুষ্টি আছে খোলা বাগানেও। উদাহরণ রায়পুর, মানাবাড়ি, রেড ব্যাঙ্ক। প্রায় প্রতিটি বাগানে প্রকৃত চিকিৎসকের অভাব। চা শ্রমিকরা দলে দলে উত্তরবঙ্গ ছেড়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে, শিশু-নারী শ্রমিকরা পাচার হচ্ছে— দেশ-বিদেশে। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি মানুষের চা শ্রমিকদের অভাব, দুঃখ বা যন্ত্রণাটা বোঝা প্রয়োজন।

পাশাপাশি পেনশনভোগী চা শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে সিপিএম প্রভাবিত চা-বাগান মজদুর ইউনিয়ন, যা চা-বাগানের ইতিহাসে প্রথম বলে দাবি সাংগঠনিক নেতৃত্বের। চালসায় ওয়েস্ট বেঙ্গল টি গার্ডেন এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাকক্ষে আয়োজিত হয়েছিল এই কনভেনশন। সমিতির নাম ইপিএস পেনশনারস' সমিতি। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিকরা মাসে মাত্র এক হাজার টাকা পেনশন পান। ২০১৩ সালের আগে এই পরিমাণ আরও কম ছিল। চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর আলমের কাছ থেকে জানা গেল, অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিকরা এই সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁদেরকে এক মঞ্চে নিয়ে এসে দীর্ঘ দিনের অবহেলা ও বঞ্চনার অবসান ঘটানোই নতুন সমিতির লক্ষ্য। এটি মূলত একটি সামাজিক সংগঠন। অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ পেনশনের পরিমাণ বাড়িয়ে এক হাজার টাকা থেকে তিন হাজার টাকা করার পাশাপাশি সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিককে পেনশনের আওতায় আনার দাবি তোলা হয়। সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ৪৭ জনকে নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতিও তৈরি হয়েছে।

চা-বাগিচাগুলোতে তৃণমূলের চারটি থেকে পাঁচটি সংগঠন কিছুদিন আগে পর্যন্ত একসঙ্গে কাজ করছিল। কারও সঙ্গে কারও তেমন বনিবনা ছিল না। বিভিন্ন ইস্যুতে সাংগঠনিক মতপার্থক্য হামেশাই প্রকাশ্যে চলে আসত। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী তথা দলীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও কর্ণগোচর হয় এবং তিনি উষ্মাও প্রকাশ করেন। অবশেষে দলনেত্রী সব ক'টি আলাদা আলাদা চা শ্রমিক সংগঠনের অস্তিত্ব বিলোপ করে দলের

ওপরে: চা নিয়ে চলছে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাচক্র, নিচে: ডুয়ার্সে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সফর

একটিমাত্র চা শ্রমিক সংগঠনের কথা ঘোষণা করেন। সেই মোতাবেক 'চা-বাগিচা তৃণমূল কংগ্রেস শ্রমিক ইউনিয়ন' নামে নতুন সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। বাগিচার সমস্ত দলীয় শ্রমিক সংগঠনকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় কালচিনির শ্রমিক নেতা মোহন শর্মাকে। যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবে বসানো হয় পাহাড়ের নেতা রাজেন মুখিয়া এবং মালবাজারের বিধায়ক বুলু চিকবরাইককে। কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে, দলের একাধিক শ্রমিক নেতার মধ্যে মতপার্থক্য কমার কোনও সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। আর সেই কারণেই উদ্‌বেগ বাড়ছে চা-বলয়ে।

এমনিতেই প্রস্তাবিত পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি)-এর আওতা থেকে ছাড় দেওয়া না হলে মুখ থুবড়ে পড়বে চা-শিল্প। তাই চা-কে জিএসটি-মুক্ত করতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের অর্থ মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত এমপাওয়ারড কমিটির চেয়ারম্যান অমিত

মিত্রর কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন চা-মালিকদের সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা।

বর্তমানে চালু থাকা মূল্যযুক্ত কর বা ভ্যাট ব্যবস্থায় চা-কে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থায় চায়ের উপর সব মিলিয়ে কর ৫-৬ শতাংশ। কিন্তু প্রস্তাবিত জিএসটি বিলে সর্বনিম্ন ১২ শতাংশ করের কথা বলা হয়েছে। চা-কে যদি ওই সর্বনিম্ন হারে রাখাও হয়, তবুও এক ধাক্কায় খরচ অনেকটা বেড়ে যাবে, যা সামাল দেওয়ার মতো পরিস্থিতি বাগানগুলোর নেই। এর মূল কারণ উৎপাদন ব্যয়ের লাগামছাড়া বৃদ্ধি এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন। চা-শিল্পমহলের দাবি চা-কে বাগিচা ফসলের পরিবর্তে কৃষিজাত পণ্যের স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাবিত জিএসটি থেকে অব্যাহতির দাবি তোলা হয়েছে। চা-কে কেন কৃষিজাত পণ্যের তকমা দেওয়া প্রয়োজন, তারও ব্যাখ্যা দিচ্ছে চা-শিল্পমহল। তাদের মতে, ১৯৯৪ সালের অর্থ আইনে ৬৫(৬) নং ধারা এবং ২০১৬ সালের খসড়া জিএসটি বিল অনুযায়ী কৃষিজাত পণ্যের যা সংজ্ঞা রয়েছে তা চায়ের ক্ষেত্রে যথার্থভাবে প্রযোজ্য। পাশাপাশি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে চা-বাগানের মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ জীবিকানির্বাহ করেন। চা-শিল্পের প্রেক্ষাপটে সর্বনিম্ন ১২ শতাংশ হারের করও চরম দুরবস্থা ডেকে আনবে বলে চা-শিল্পমহল মনে করে। ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ারে ২২টি এবং জলপাইগুড়িতে ৯৭টা বাগান সরকারি খাতায় রুগ্ণ হিসাবে চিহ্নিত। বেশ কয়েকটা বন্ধ চা-বাগানও আছে। করের মাধ্যমে চায়ের মোট উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেলে অন্য বাগানগুলোতে সমস্যা দেখা দিতে পারে। চা-শিল্প অত্যন্ত সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। জিএসটি চালু হলে তা থেকে চা-শিল্পকে ছাড় না দিলে পরিস্থিতি আরও মারাত্মক হয়ে উঠবে।

বাগিচার শিশুরা এভাবেই অবহেলা ও অনাদরে মানুষ হচ্ছে

মাটিগাড়াতে মুখোমুখি হলাম উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক দেবাশিস পালের সঙ্গে। তিনি উত্তর দিনাজপুর জেলার ক্ষুদ্র চা-চাষিদের সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে জানালেন, এক শ্রেণির কাঁচা পাতার ব্যবসায়ী তথা দালালরা চা-চাষিদের অগ্রিম টাকা দিয়ে দিচ্ছেন, যাতে পরবর্তীতে ঋণগ্রস্ত চাষিদের কাছ থেকে কিছুটা হলেও কম দামে কাঁচা পাতা কিনতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র চা-চাষিরা মহাজনের থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। নোট বাতিলের জেরে তীব্র আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন চোপড়া এবং বিধাননগর-সোনারপুরের চা-চাষিরা। সরকারিভাবে কোনওরকম সুযোগ-সুবিধাও মেলেনি তাঁদের। উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকে সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্র চা-চাষি রয়েছে। প্রায় কুড়ি হাজার চা-চাষির মধ্যে একটা বড় অংশই শুধুমাত্র চা-বাগানের উপর নির্ভরশীল থেকেই সংসার প্রতিপালন করে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাগান পরিচর্যার জন্য কাঁচা পাতা না তোলার ফলে নগদ টাকা ছিল না হাতে, অন্য দিকে অর্থনৈতিক কারণে বাগান পরিচর্যার ক্ষেত্রে সমস্যায়ও পড়েছেন তাঁরা। কোনও কোনও চাষি ধান-পাট বিক্রি করে যা উপার্জন হত, তার বেশির ভাগই বাগান পরিচর্যার কাজে লাগত। এবারে ধানের দাম আশানুরূপ নয়, তার উপর চা-চাষে যদি লাভের টাকা ঘরে না-ই এল তাহলে চা-চাষ করে আর লাভ কী— এই মনোভাব মাথাচাড়া দিচ্ছে। দেবাশিসবাবুর অভিযোগ, টি বোর্ড থেকে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা এখানকার চাষিরা খুবই কম পান। অধিকাংশ চাষির স্মার্ট কার্ড না থাকায় তারা ব্যাঙ্ক থেকেও ঋণ বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পায় না। জেলার ক্ষুদ্র চা-চাষিরা ক্রেডিট কার্ড থেকে বঞ্চিত, চা-শিল্পে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিগুণ বরাদ্দ ঘোষণা করলেও এখানকার চাষিরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিষয়টা চা-পর্ষদ, জেলা প্রশাসন এবং নাবার্ডকে জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না— উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর অভিযোগ। অন্য দিকে জানা গিয়েছে, চা-চাষিদের কিষান ক্রেডিট কার্ড পেতে নাবার্ড-এর অনুমোদন প্রয়োজন হয়, অথচ এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখনও বিশ বাঁও জলে।

বাড়িঘর কিবা প্রয়োজন? ঠাঁই যখন কোনওমতে। নির্মম শোষণের এক চিত্র

তবে রাজ্য সরকার চা-বাগিচাগুলোর বা সামগ্রিকভাবে চা-শিল্পের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে না— এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। কোনও বাগান বিক্রি বা মালিকানা হস্তান্তরের পর নতুন মালিককে আইন মোতাবেক সরকারের কাছে এককালীন যে টাকা দিতে

হয় তা সেলামি নামে পরিচিত। এর আগে বাগানের জমির মোট আয়তনের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা সরকারি দরে ওই টাকা এক কিস্তিতেই দিতে হত। উত্তরবঙ্গের বহু চা-বাগানের মালিকানা বদল হলেও সেলামির প্রচুর টাকা বকেয়া পড়ে ছিল। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার চা-বাগানগুলোর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ছিল প্রায় একশো কোটিরও বেশি। সেলামি যাতে কিস্তিতে দেওয়া যায়, সেই আর্জি জানিয়ে চা-বাগিচাগুলো এর আগে একাধিকবার রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চা-মালিকরা মোট ৬০টি কিস্তির অনুরোধ জানিয়েছিল। ওই পরিমাণ কিস্তি মেনে না নিলেও রাজ্য সরকার ৭টি কিস্তিতে সায় দেওয়ায় মোটের উপর সন্তুষ্ট চা-বাগিচাগুলো। ২০১৫-র ৩ আগস্ট জারি করা সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুযায়ী ২০১১-র ৩১ মার্চের আগে যেসব চা-বাগানের মালিকানা বদল হয়েছে, সেই বাগানগুলোর জন্য সেলামির পরিমাণ বর্তমানে হেক্টরপ্রতি ৯০০ টাকা। ওই সময়ের পর হাতবদল হওয়া বাগানের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ হেক্টরপ্রতি ১৫০০০ টাকা। ডুয়ার্স-তরাই জুড়ে বকেয়া থাকা বাগানের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। কিস্তিতে টাকা প্রদানের সুযোগ মেলায় সরকারি রাজস্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাশাপাশি বাগানগুলোও বকেয়া মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে। চা-মালিকদের শীর্ষ সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অব প্ল্যান্টারস অ্যাসোসিয়েশন-এর সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা, প্রখ্যাত চা বিশেষজ্ঞ রাম অবতার শর্মা, টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার ডুয়ার্স শাখার অন্য পদাধিকারীরা রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

শুধু রাজ্য সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তা নয়, ভারতীয় চা-পর্ষদও স্মার্ট চা-চাষি তৈরি করতে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছে। যেসব চা-চাষি চা-পর্ষদের শস্যসুরক্ষা বিধি মেনে কম ব্যয়ে বেশি মুনাফা করতে পারবেন, তাঁরাই হবেন স্মার্ট চাষি। ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য সংগঠক বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গেল, ভারতীয় চা-পর্ষদের উদ্যোগে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলাব্যাপী ৬৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে দফায় দফায়। জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে চা বিশেষজ্ঞরা ক্ষুদ্র চা-চাষিদের স্মার্ট চা-চাষি হওয়ার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। ভারতীয় চা-পর্ষদের প্ল্যান্ট প্রোটেকশন কোড মেনে চাষিদের চা-চাষ করতে হবে। কী কী কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে, তার উল্লেখ আছে পিপিসি-তে। এ ছাড়াও চা-বাগিচার রক্ষণাবেক্ষণ, পাতা তোলার কৌশল, রোগ ও পোকা দমনে সার, কীটনাশক এবং অণুখাদ্য ব্যবহারসহ চা-চাষের খুঁটিনাটি শেখানোর কাজ চলছে প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে। নাগরাকাটার চা-গবেষণাকেন্দ্রের (টিআরএ) চা বিশেষজ্ঞ ডঃ তৃণা মণ্ডল, ডঃ মৃদুল শর্মা প্রমুখর নেতৃত্বে এই কর্মযজ্ঞে জেলাব্যাপী স্মার্ট চা-চাষিরা উৎসাহ নিয়ে যোগদান করেছেন। কৌশিক রায় নিজের ১০ একর জমিতে প্রতিটি চা গাছের জন্য সার দিয়েছেন ২০০ গ্রাম। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন, গাছপিছু ৮০ গ্রাম সারই যথেষ্ট ছিল। পাঁচ একর জমিতে চা-চাষ করতে গিয়ে এতদিন অকারণে অতিরিক্ত

ভারতীয় চা-পর্ষদের উদ্যোগে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলাব্যাপী ৬৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে দফায় দফায়। জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে চা বিশেষজ্ঞরা ক্ষুদ্র চা-চাষিদের স্মার্ট চা-চাষি হওয়ার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

সেচ দিয়েছেন বলে জানতে পারলেন হরিশ্চন্দ্র রায়। বিপদ যে ওষুধের টিনেই ঘাপটি মেরে বসে আছে, কে জানত? ওষুধ মানে কীটনাশক। নিজের সওয়া দুই একর জমি জুড়ে থাকা চা গাছে পোকা ধরলেই, জলে মিশিয়ে ওই ওষুধ দেদার ছড়িয়ে দিতেন সৌমেন ঘোষ। কিন্তু পানবাড়িতে আসা সংস্থার বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে দিলেন, দুনিয়া জুড়ে ওই ওষুধ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। কারণ ওই কীটনাশক এতটাই ক্ষতিকর যে, শরীরে ঢুকে মহিলাদের গর্ভস্থ সন্তানকেও পঙ্গু করে দিতে পারে।

সৌমেন, কৌশিক, হরিশ্চন্দ্ররা পানবাড়িতে তৈরি হওয়া ক্ষুদ্র চা উৎপাদকদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকে রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশো। গোষ্ঠীটি ২৯৭ হেক্টর জমিতে বছরে ৩৫ লক্ষ কিলোগ্রামেরও বেশি কাঁচা চা-পাতা উৎপাদন করছে। লাভের টাকা এবং টি বোর্ডের আর্থিক সহযোগিতায় ২০১২ সালে চায়ের কারখানাও চালু করে ওই স্বনির্ভর গোষ্ঠী। টি বোর্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চা-চাষিদেরকে বিজ্ঞাননির্ভর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। টি বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশে মোট উৎপাদিত চায়ের ৩৩ শতাংশ ক্ষুদ্র চাষিদের কাছ থেকে এলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই চায়ের মান ভাল নয়। সেই মান উন্নত করার জন্যই পানবাড়িতে পাইলট প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। কারণ দেশের মধ্যে পানবাড়িতেই প্রথম ক্ষুদ্র চা-চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কারখানা তৈরি হয়েছে। বছরে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ কেজি চা উৎপাদিত হচ্ছে সেখানে। পানবাড়ির ওই গোষ্ঠীর বাৎসরিক লাভের পরিমাণ প্রায় কোটি টাকা। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ করে পানবাড়ির ক্ষুদ্র চা-চাষিরা জলের অপচয় রোধ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চা-চাষ করা শুরু করেছে। প্রশিক্ষকরা জমির পরিমাণ, সেচের জলের উৎস ও পদ্ধতি, কীটনাশক এবং সারের প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে সবিস্তার তথ্য সংগ্রহ করে সেই তথের ভিত্তিতে দশজন স্মার্ট চাষিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করে দেবার পর তারাই পরিবেশবান্ধব এবং উন্নতমানের চা তৈরির প্রশিক্ষণ দিচ্ছে অন্য চাষিদের।

উত্তরের চা-বাগিচাগুলো নেই-রাজ্যের বাসিন্দা। চা-শিল্পে যদি সত্যিই সংকট দেখা দেয় তাহলে ৯০ শতাংশ চা-বাগান খোলা রয়েছে কোন যুক্তিতে? দেখা যাচ্ছে, নিলামকেন্দ্রই হোক বা খোলা বাজার— চায়ের দাম ক্রমবর্ধমান। ভাল মানের চা যাঁরা তৈরি করছেন, তাঁরা ভালই দাম পাচ্ছেন। অন্য সব ক্ষেত্রের মতো চায়ের উৎপাদন খরচ অবশ্যই বেড়েছে, পাশাপাশি এটাও ঘটনা যে চায়ের উৎপাদন বেড়েছে। দামও বেশি মিলছে। শ্রমিকপক্ষও আবার নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে সমস্ত দায় চাপিয়ে দেয় মালিকদের ঘাড়ে। সমস্ত শ্রমিক যে খুব ভাল কাজ করে, ফাঁকি মারে না— এ কথা বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু সব শ্রমিক কাজে ফাঁকি দিলে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির ঘটনাটি ঘটছে কোন সে নিয়মে? প্রশ্ন হচ্ছে, সবচেয়ে খারাপ দিনেও উত্তরবঙ্গের মোট চা-বাগানের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুনাফার ভাগ নিয়ে অনেক মালিকপক্ষেরই বাগান ফেলে চলে যাবার ঘটনা ঘটে সময়ে সময়ে। ৯০ শতাংশ চা-বাগানের মালিকরা নিশ্চয়ই লোকসানের বোঝা বয়ে চা-বাগান খোলা রাখছেন না? তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, অন্যান্য মালিকপক্ষ যখন চা-বাগান চালাচ্ছেন, সেই সময়ে দশ শতাংশ বাগান মালিক কেন বাগান চালাতে চাইছেন না? এর উত্তর দেবার আগে উত্তরের চা-বাগিচার একটা জলজ্যান্ত সমস্যাকে অস্বীকার করা যায় না।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 15,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

এনইপিডব্লিউইউ-এর বানারহাট সাংগঠনিক ব্লকের নেতা মহম্মদ শামীম, পিটিডব্লিউইউ-এর নেতা মহেশ্বর মাহালি, নাগরাকাটার ক্যারন চা-বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার প্রিয়ব্রত ভদ্রর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ভারত-ভুটান সীমান্ত এলাকায় নাগরাকাটা ব্লকের ক্যারন, গ্রাসমোড়, লুকসান, ধূপগুড়ি ব্লকের চামুর্চি, চুনাভাটি, কাঁচালগুড়ি, পলাশবাড়িসহ ডুয়ার্সের বহু চা-বাগান থেকে শ্রমিকরা নগদ টাকা আয়ের জন্য প্রতিবেশী দেশ ভুটানে চলে যাচ্ছে। ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকার বেশির ভাগ চা-বাগানেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। শ্রমিকদের হাতে নগদ অর্থ না থাকার ফলে ঘরে ঘরে খাদ্যসংকট। তাই পেট চালাতে নগদ টাকার সন্ধানে বিভিন্ন বাগানের প্রায় ৫০ শতাংশ শ্রমিক প্রতিবেশী দেশ ভুটানে পাড়ি দিচ্ছে। ভারতীয় নোটের আকাল থাকায় ভুটানি নোট দিয়ে চা শ্রমিকরা প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সেরেছে। বাগানে প্রচুর পরিমাণে চা-পাতা ফললেও সেগুলো তুলতে যত শ্রমিক প্রয়োজন, তত শ্রমিক পাওয়া যায় না। বাইরে থেকেও কেউ পাতা তোলার কাজে আসছে না। ফলে গাছেই পাতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিলের ফলে হাতে টাকা না থাকায় বিভিন্ন চা-বাগান থেকে শ্রমিকরা কাজের জন্য ভুটানে চলে গিয়েছে। ফলে চা-পাতা তোলার জন্য শ্রমিক মিলছে না। নভেম্বরের পরবর্তীকালে নগদ টাকার সন্ধানে সেই যে শ্রমিকরা ভুটানে চলে গিয়েছে, তারা আর ফিরে আসেনি। ফলে শ্রমিকসংখ্যা কম থাকার জন্য কাঁচা চা-পাতা তোলা না যাবার ফলে গাছে পাতা নষ্ট হয়ে চায়ের উৎপাদন মার খাচ্ছে। ফলে ক্ষতি হচ্ছে চা-শিল্পের।

সামনে ২০১৮ সালে আবার পঞ্চায়েত নির্বাচন আসছে। এবারের উত্তরের চা-বলয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক উন্নয়নের নিরিখে। সমবায়ের মাধ্যমে আবার উৎপাদন শুরু হোক ধরণিপুর, রেড ব্যাঙ্ক, সুরেন্দ্রনগরে। নাগরাকাটা থেকে বানারহাট পর্যন্ত যত রুগ্‌ণ বাগান আছে, সেগুলোকে লালন-পালন করা হোক। খুলুক মানাবাড়ি। কাঁচালগুড়ি, রহিমাবাদ আবার আগের মতোই গমগম করুক। হাসি ফুটুক শ্রমিক-কর্মচারীদের মুখে। বাগান মালিকরা কোন পথ ধরে বা কীসের ভিত্তিতে ছোট ও মাঝারি চা-বাগানগুলোতে বিনিয়োগ করবে, তার পরিকল্পনা সরকারকেই করতে হবে। স্বশাসিত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা হলে বাগিচার মুনাফার অর্থ উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। ব্যাঙ্কগুলোর সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলোকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। পর্ষদের নিয়ন্ত্রণ চা-বলয় অধ্যুষিত গ্রামগুলোর উপর থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো অনেক সক্রিয় হয়ে উঠতে পারবে। বাগিচা মালিকদের বিভিন্ন সংগঠনে শ্রমিক প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করতে হবে। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টারস অ্যাসোসিয়েশন-সহ যে সংস্থাগুলো বাগান মালিকদের স্বার্থ ও সুবিধা দেখার জন্য কাজ করে, তারাও পরিকল্পিতভাবে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে সচেষ্ট হয়নি। প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হলেও চা-বাগানের শ্রমিক শোষণ এবং বনজ সম্পদ তছরুপ ঠেকানো যায়নি। তাই স্বশাসিত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে শিল্পস্থাপনের অন্তরায় হিসাবে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতাকে কাটিয়ে সরকারকে উত্তরের সবুজ চা-বলয়ের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য টি-টিম্বার-টুরিজমকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

দুঃখের আবহেও উৎসবের সুর

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা। শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭
পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।
ছ'মাসের এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

পাহাড়ে রাজনীতির নয়া সমীকরণ

দিন কি বদলাবে পাহাড়িদের ?

জ্যোতি বসু সুবাস ঘিসিং বুদ্ধ ভট্টাচাজ্জি বিমল গুরুংরা গত তিন দশক ধরে যা চান নি কিংবা পারেন নি, পাহাড়ের সেই ম্যাজিক মন্তরটির নাগাল পেয়ে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন প্রজন্ম গোর্খাল্যান্ড চায় না, চায় জীবিকার সহজতম পথ। বন্ধ-আগুনের আন্দোলনে উন্নতির পথ যে রুদ্ধ হয়ে যায় এই সহজ সত্যিটা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না এযুগের পাহাড়ি তরুণের। অতএব গুরুং-দাজুরা এখন ব্যাকডেটেড, অন্তত শহর এলাকার তরুণ প্রজন্মের কাছে তো বটেই। রোজগেরে রাজনীতির জমানায় ঘাসফুলেই আস্থার ইঙ্গিত মিলছে, আসন্ন পুর নির্বাচনে চটপট তারই ফায়দা তুলতে চাইছেন দলনেত্রী। যদিও পদ্মফুলের কাঁটার ভয় রয়েছেই। দিল্লিতে বসে যে কর্তারা এতদিন ঘোলাজলে মাছ ধরে গিয়েছেন, গুরুংবাহিনীরও তাঁদের দেখানো মুলোতেই হাসিমুখে বিশ্বাস রাখা ছাড়া অন্য উপায় নেই, ইউপি জয়ের পর পাহাড়ে ভেল্কিবাজি দেখানোর ইজারা তাঁরা বিনাশর্তে দিদিভাইকে ছেড়ে দেবেন এমনটি ভাববার কোনও কারণ নেই। মনে রাখতে হবে পাহাড়ের জন্য ধনরত্নের বেশিরভাগটাই আসে সেই দিল্লি থেকেই। সব মিলিয়ে বহুদিন পরে বাংলার হিমালয়ে ক্ষমতা দখলের নতুন সমীকরণের সূচনা হয়েছে এবং তা যে বেশ 'ইন্টারেস্টিং' এব্যাপারে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। এখন যেটা দেখার তা হল— লোকচক্ষুকে আড়াল করে তাদের 'বোঝাপড়া'টা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! আর সেই বোঝাপড়ায় পাহাড়ের মানুষগুলির দূর্দশার দিনলিপি কি আদৌ শেষ অব্দি পাল্টাবে?

এ যেন বেড়াল থেকে বাঘ হয়ে ওঠার গল্প! ছিল না কিছুই। এখন চারদিকে তাদের জোড়া ফুলের হাওয়ায় ভাসছেন হাজার হাজার মানুষ। দার্জিলিং পাহাড়ের রাজনীতির ক্ষেত্রে এ যেন এক রূপকথার মতোই গল্প। রাজ্যের কোনও শাসকদল পাহাড়ে গিয়ে শূন্য থেকে বাঘ হবে, তা গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ছিল সেখানকার লোকেদের কাছে ধারণার বাইরে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে তেমনটাই হয়েছে। পাহাড়ের বহু সাধারণ মানুষ থেকে অনেক রাজনৈতিক নেতাও এমন কথাই বলছেন। পাহাড়ে এ এক বিপ্লবের গল্প হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কথাই বলা হচ্ছে। সুকনা থেকে দার্জিলিং, ওদিকে মিরিক থেকে কালিম্পং— সর্বত্র এখন আলোচ্য বিষয় রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালিম্পংয়ে তৃণমূল কর্মীদের উচ্ছ্বাস

রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের একসময়কার বামফ্রন্ট সরকারের পুরোধা জ্যোতি বসু দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের শাসনক্ষমতায় থেকে এক বিরাট ইতিহাস তৈরি করেন। সুবাস ঘিসিঙের নেতৃত্বে দার্জিলিং যখন পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে অগ্নিগর্ভ, সেই সময় পাহাড় শান্ত করতে তৈরি হয়েছিল 'দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ'। আর সেই ডিজিএইচসি তৈরি করে সুবাস ঘিসিং নামক বাঘকে খাঁচায় পুরে জ্যোতিবাবু দিনের পর দিন পাহাড়ের লাটাইটা কার্যত নিজের হাতেই রেখে দিয়েছিলেন। যদিও পাহাড়ের ভোটগুলোতে সেভাবে দাঁত ফোটাতে পারেনি জ্যোতিবাবুদের লাল পার্টি বা তাঁদের বামফ্রন্ট। কখনও একতরফা ভোট, কখনও জ্যোতিবাবুর বুদ্ধিমত্তাতেই ঘিসিং ভোট বয়কট করেছেন বিভিন্ন ইস্যুতে আর এখান থেকে সাংসদ জিতিয়ে এনেছেন জ্যোতিবাবু। কয়েকবার অবশ্য কংগ্রেসও ঘিসিংকে নিয়ে খেলা খেলে তাদের সাংসদ জিতিয়ে নিয়ে গিয়েছে দিল্লিতে। যা-ই হোক, এভাবে পাহাড়ের আগুন সাময়িকভাবে ছাইচাপা দিয়ে রাখলেও ঘিসিং দিনের পর দিন ধনসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে নিজেকে পাহাড়ের রাজা ভাবতে শুরু করেছিলেন। ফলে পাহাড়ে ঘিসিঙের জিএনএলএফ বাদে কোনও দলের অস্তিত্বই ছিল না। যদিও গণতন্ত্রে বেশি দিন রাজতন্ত্র চলে না। সময় মানুষকে দেয় উচিত শিক্ষা। ঘিসিং জমানারও একদিন শেষ হল। তাঁকে বিদায় নিতে হল পাহাড় থেকে। উঠে এলেন একদা ঘিসিং-ঘনিষ্ঠ বিমল গুরুং। ঘিসিং-বিরোধিতা করেই তাঁর উত্থান পাহাড়ে। ইস্যু ওই ঘিসিঙের দুর্নীতির বিরোধিতা করা আর পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে পাহাড় আবার বন্‌ধে বন্‌ধে উত্তাল হয়ে উঠল। বিধ্বস্ত হয়ে গেল সেখানকার পর্যটন ব্যবসা। পাহাড় ও সমতলের মধ্যে একটা অস্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হল। জ্যোতিবাবুর অবর্তমানে বিগত বাম-সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পাহাড়ে তাঁদের দলের রাজ্য সম্মেলন করতে গিয়েও ফিরে এলেন। তাঁদের দলের সম্মেলন দার্জিলিং থেকে সরিয়ে আনতে হল সমতল শিলিগুড়িতে, যা রাজ্যের শাসনব্যবস্থার প্রতি বিরাট ধাক্কা। তারপর থেকে আর পাহাড়ে কার্যত পা-ই রাখতে পারেনি সিপিএম ও তার সহযোগী দলগুলো। একসময় ঘিসিং যেমন ছিলেন পাহাড়ের শেষ কথা, তেমনই পরবর্তীতে গুরুংই হয়ে ওঠেন পাহাড়ের শেষ কথা। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার জোয়ারে ভাসতে থাকে গোটা পাহাড়। রাজনৈতিক মহলের মতে, গুরুংও সেই গোর্খাল্যান্ডের দাবির প্রশ্ন তুলে ঘিসিঙের মতো কখনও রাজ্য, কখনও কেন্দ্রকে নিয়ে খেলতে শুরু করলেন। একটা সময় রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে তাঁর সখ্য ভালই ছিল। কিন্তু রাজ্যের শাসনক্ষমতায় এখন জ্যোতিবাবু নেই বা বুদ্ধদেববাবু নেই, শাসনক্ষমতায় এখন একসময়কার লড়াকু নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অগ্নিকন্যা মমতার দলের কথা, মা-মাটি-মানুষ। তিনি দেখলেন, পাহাড়ের মাটি কি বাংলার মাটি নয়? পাহাড়ের মানুষ কি বাংলার মানুষ নন? তবে গুরুং কেন পাহাড়ে একা রাজ করবেন? তিনি দেখলেন, পাহাড়ে কেন গণতন্ত্র থাকবে না? কেনই শুধু গোর্খাল্যান্ড? তিনি খোঁজ করলেন গোর্খাল্যান্ড দাবির নেপথ্যে কী। তাঁর প্রচেষ্টাতেই অশান্ত গুরুংকে প্রথমে শান্ত করা হল। তৈরি হল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ। জিটিএ দিয়ে বেঁধেই সুতো ছাড়া শুরু হল। গুরুং বেশ লম্ফঝম্প শুরু করলেন। আর মুখ্যমন্ত্রীও পাহাড়ের মানুষের আসল সমস্যা খতিয়ে দেখতে থাকলেন। জানতে চেষ্টা করলেন, গোর্খাল্যান্ড দাবির নেপথ্যে প্রকৃত সত্য। রহস্যও বেরিয়ে এল। তিনি দেখলেন, পাহাড়ে পিছিয়ে পড়া বহু জনজাতি রয়েছে। পাহাড়ে অনেক সমস্যা রয়েছে। দিনের পর দিন পাহাড়ের মানুষ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ আরও বহু সমস্যা রয়েছে। আর পিছিয়ে পড়া সেইসব মানুষের কথা কেউ শোনেনি। দিনের পর দিন বঞ্চনা থেকে ক্ষোভের পারদ জমতে জমতে তাঁরা বিচ্ছিন্ন

হতে চাইছেন রাজ্য থেকে। আর তাঁদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতি করে ঘিসিং, গুরুংরা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করছেন দিনের পর দিন। লড়াকু ও অত্যন্ত সাহসী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুঙের সেই সাম্রাজ্যে দিলেন ধাক্কা। গুরুং দেখলেন, আর তো হুংকার দিয়েও চিঁড়ে ভিজছে না। বরং দিনের পর দিন পাহাড়ে এসে পাহাড়ের লোকের সঙ্গে কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের প্রিয় কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। গুরুং তখন বিজেপি বা কেন্দ্রভজনা শুরু করলেন পুরোদমে। গত লোকসভা ভোটে বিজেপি দেখল, রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে গুরুঙের দূরত্বকে কাজে লাগিয়ে যদি একটা আসন দার্জিলিং থেকে তুলে আনা যায়, তবে ক্ষতি কী? তাই গুরুং ও বিজেপির সখ্য বাড়তে থাকল। তাঁদের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা হয়ে গেল। গত লোকসভায় বিপুল ভোটে জিতলেন আলুওয়ালিয়া। কিন্তু লড়াকু নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী হাল ছাড়তে রাজি নন। তিনি পাহাড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে একেবারে সরাসরি গুরুঙের সামনেই বাংলা ভাগের বিরোধিতা করলেন। তিনি দার্জিলিঙের মাটিতেই পরিষ্কার বললেন, পাহাড়ে উন্নয়নের জন্য তিনি সবসময় আছেন। কিন্তু বাংলা ভাগ করে নয়। তাঁর সেই সাহসিকতা পাহাড় থেকে সমতল এক নতুন হিল্লোল তোলে। রাজনৈতিক মহলের খবর, ঘিসিং-বিরোধিতা করে গুরুং যেভাবে উঠেছেন, তেমনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি পাহাড়ে গুরুং-বিরোধিতা করে পাহাড়ের বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর কাজ শুরু করলেন। আর তার ফল পাওয়াও শুরু করলেন। তিনি একের পর এক তৈরি করলেন বিভিন্ন উন্নয়ন বোর্ড। ফলে দিনের পর দিন কোণঠাসা হতে থাকলেন গুরুং। তাঁর সঙ্গী ডঃ হরকা বাহাদুর ছেত্রী থেকে শুরু করে প্রদীপ প্রধান-সহ আরও অনেকে তাঁর সংস্রব ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই নতুন ইতিহাস তৈরির ধাক্কায় এবারে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সামনে তো পাহাড়ের চার পুরসভার ভোট— দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ও মিরিক। কী হবে নতুন নির্বাচনী সমীকরণ? কে জিতবে এই ভোটে? তারই বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে পাহাড়ের কোণে।

একদা গুরুং-সন্ত্রাসে পাহাড় কেঁপেছে। প্রকাশ্যে খুন হয়েছেন গোর্খা লিগ সভাপতি মদন তামাং। তার বিচার এখনও চলছে। ফলে পাহাড়ে কেউ সাহস করে কথা বলতে পারছিলেন না। পাহাড়ে গুরুং-বিরোধিতা মানে মৃত্যু— এমনই একটা ব্যাপার ছিল। অশান্তিতে সেখানকার পর্যটন শেষ হয়ে গিয়েছিল। পর্যটনের উপর সেখানকার বহু মানুষের রুটিরুজি চলে। অনেক হোটেল ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে গাড়ির মালিক, গাড়িচালক, টুর অপারেটর— সকলের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন গুরুং ও তাঁর সঙ্গীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে নতুন আশার আলো দেখিয়েছেন। তার সঙ্গে নতুন পনেরোটি বোর্ড। গুরুং, নেওয়ার, লেপচা, ভুটিয়া, শেরপা, রাই— সকলের জন্য উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে মুখ্যমন্ত্রী বিমল গুরুঙের স্বর্গরাজ্যে একেবারে শূন্য থেকে বাঘের থাবা বসাতে থাকলেন। তার সঙ্গে বহুবিধ উন্নয়ন। বহু অর্থসাহায্য। সব শেষে নতুন জেলা কালিম্পং। তারপর আবার মিরিক মহকুমা। ফলে মমতা-হাওয়া পাহাড় জুড়ে। কেউ তাঁকে পাহাড়ের দেবী, কেউ পাহাড়ের নতুন আলোর শিখা, কেউ বা পাহাড়ের রানি বলতে শুরু করলেন। ফলও মিলতে শুরু করে দিয়েছে। গত বিধানসভার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস পাহাড়ে কোনও আসন না পেলেও অনেক ভোট পেল। যাদের অস্তিত্বই ছিল না পাহাড়ে, সেখানে ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে দার্জিলিঙে প্রাপ্ত ভোট ৪৫,৪৭৩। কালিম্পঙে কোনও প্রার্থী ছিল না। আর কার্শিয়াঙে ৫৩,২২১টি ভোট। জয় না হলেও বিরাট লাভ। কার্শিয়াঙে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন শান্তা ছেত্রী। তিনি একসময় জিএনএলএফ-এর লড়াকু নেত্রী ছিলেন। বেশ কয়েকবার তিনি বিধায়কও হন। তিনি জানালেন, গত বিধানসভা ভোটে কার্শিয়াঙে পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯টিতেই এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। কার্শিয়াং পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, শহর এলাকাতে গুরুঙের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ভোট পেয়েছে ৪৬ শতাংশ, আর তৃণমূল পেয়েছে ৪১ শতাংশ। সেই সময় তৃণমূলের সংগঠনও এত শক্তিশালী ছিল না। তাতেই যদি এই ফলাফল হয়, তবে এবারে কী হবে পুরসভার ভোটে, আপনারাই বিচার করুন।— প্রতিবেদকের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দেন খোদ শান্তা ছেত্রী। জিএনএলএফ অবশ্য সমর্থন দিয়েছিল তৃণমূলকে।

একদা গুরুঙের ঘনিষ্ঠ ছিলেন প্রদীপ প্রধান। তিনি জিটিএ-র চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি এখন তৃণমূলে। তাঁর পরিষ্কার কথা, মোর্চা আর পাহাড়ে এগতে পারবে না। কারণ তাদের ঘিরে দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়েছে। শুধু গোর্খাল্যান্ডের কথা বলে আর বন্‌ধের রাজনীতি করে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে পাহাড়কে। এখন তাই দলে দলে মোর্চা সমর্থকরা সব তৃণমূলে চলে আসছেন। কার্শিয়াং পুরসভা তৃণমূল দখল করছে, একশো ভাগ নিশ্চিত। কিন্তু দার্জিলিং ও কালিম্পং? সে প্রশ্নে এখনই অতটা জোরের সঙ্গে দাবি করতে না পারলেও তৃণমূলের নেতা বিন্নি শর্মা বলেন, আমরা সর্বত্রই ভাল ফল করব। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর বারবার পাহাড়ে আসা আর উন্নয়নের কাজ করা। পাহাড়ের জন্য অতীতে কেউ এত কাজ করেনি।

পাহাড়ের বহু সাধারণ মানুষও বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে নেপালি কবি

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে গুরুংরা

ভানুজয়ন্তী পালন করতে চলে আসছেন। মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন করতেও চলে আসছেন। তিনি বারবার পাহাড়ের জন্য কিছু না কিছু করতে চাইছেন। আর গুরুং তো তা করেননি। মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছেন পাহাড়ের বেকাররা কাজ পাক। আর কাজ কখন হবে? যখন পাহাড় শান্ত থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী তাই গুরুঙের হুংকারকে সহ্য না করে পাহাড়ের প্রশাসনকে কড়া হাতে চালিয়েছেন। একদিকে প্রশাসনকে কড়া হাতে চালানো, অন্য দিকে নিজের সংগঠন মজবুত করা। এ এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস। পাহাড়ের বহু মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে। মিরিক মহকুমা হলে বা কালিম্পং জেলা হলে তাই হাজার হাজার মানুষ তাঁকে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাতে থাকে। পাহাড়ে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন থেকে শুরু করে কার্শিয়াঙে এডুকেশন হাব তৈরি করা-সহ আরও বহুবিধ উন্নয়নে, বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তীতে ছুটি ঘোষণা— এসবেই মুখ্যমন্ত্রীর কাজের জেরে বিজয় পতাকা উড়েছে। কার্শিয়াঙের তৃণমূল নেতারা বলেন, প্রতিদিনই পাহাড়ের সর্বত্র জিজেএম থেকে লোকজন তৃণমূলে চলে আসছেন। কার্শিয়াং ও মিরিকে তাঁদের ফল খুব ভাল হবে। ওই দু'টি স্থানে তাঁরা পুর বোর্ড গঠনে অনেকটাই এগিয়ে। যদিও দার্জিলিং ও কালিম্পং নিয়ে তাঁরা অতটা জোর দিয়ে কিছু বলতে পারছেন না। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বারবারই পাহাড়ে বার্তা দিচ্ছেন, পাহাড়ে তাঁদের দল ক্ষমতায় এলে তাঁদের পক্ষে উন্নয়নের কাজ করতে আরও সুবিধা হবে। তবে দার্জিলিং থেকে কালিম্পং, পুরসভা থেকে জিটিএ-র ভোট— সর্বত্র এত উন্নয়ন বা পিছিয়ে পড়াদের বোর্ড গঠনের ফল যে ভোটের বাক্সে পড়বে, তাতে অনেকে নিশ্চিত। সমতলেও গত বিধানসভা ভোটের ফলে দেখা যায়, 'সবুজ সাথী', 'কন্যাশ্রী', 'খাদ্যশ্রী'সহ বহু কাজের ফল ম্যাজিকের মতো ভোট বাক্সে পড়েছে। পাহাড়ও মে মাসের পুর ভোটে সেই ম্যাজিক দিতে চলেছে বলে আশাবাদী পাহাড়ের বহু তৃণমূল নেতাই। সাধারণ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও তেমন কথাই বলছেন। অন্য দিকে পাহাড়ে যে মোর্চা বিজেপি-র জোরকে পাথেয় করে কিছুটা সাহস দেখাত, সেই বিজেপি-ও কিন্তু ক্রমশ বেঁকে বসতে শুরু করেছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করে এসেছেন বিমল গুরুং। আর তাতেই তিনি লাফিয়ে চলেছেন। বলছেন, গোর্খাল্যান্ড তিনি পেয়ে যাবেন! দিল্লি থেকে পাহাড়ে ফিরে তিনি দাবিও করেছেন, গোর্খাল্যান্ড দাবি নিয়েই আসন্ন পুর ভোট ও জিটিএ ভোট তিনি পার করে দেবেন। কিন্তু তাঁর ঘাড়ে নতুন করে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে বিজেপি। উত্তরপ্রদেশসহ কয়েকটি রাজ্যের সাম্প্রতিক জয়কে কাজে লাগিয়ে বিজেপি পাহাড়েও তাদের শক্তি বাড়াতে চাইছে। নাম না ছাপার শর্তে বিজেপি-র কয়েকজন নেতা বলেন, এটা রাজনীতি। মোর্চাকে তাঁরা একতরফাভাবে সবসময় পাহাড়ের রাজনীতিতে খেলতে দেবেন না। মোর্চার সঙ্গে জোট থাকলেও বিজেপি তাদের সংগঠনকে পিছনে ফেলতে দেবে না। তাই তো আসন্ন পুর ভোট ও জিটিএ ভোটে মোর্চার সঙ্গে বিজেপি-র নির্বাচনী সমীকরণ তৈরি না হলে বিজেপি এককভাবেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রার্থী দাঁড় করাতে চায়। বিজেপি-র পাহাড় শাখার অন্যতম নেতা মনোজ দেওয়ান বলেন, চার-পাঁচ বছর আগেও তাঁদের পাহাড় শাখার সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র দু'-তিন হাজার। এখন তা ৪৫,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সমতলে যে বিজেপি হাওয়া শুরু হয়েছে তা পাহাড়েও এসে পড়েছে বলে দাবি করেন মনোজবাবু। তাঁর কথায়, পাহাড়ে বিজেপি তাদের নিজস্ব অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায়। বিভিন্ন আসনে প্রার্থী দেওয়ার জন্য বিজেপি তাদের তালিকা তৈরি করে মোর্চাকে দেবে। মোর্চা তাতে রাজি না হলে বিজেপি এককভাবেই লড়াই করবে। আর স্থানীয় পুরসভার ভোটে বিজেপি কখনওই গোর্খাল্যান্ড ইস্যু করতে চায় না। তাদের ইস্যু হবে উন্নয়ন। বলা বাহুল্য, সেই উন্নয়ন ইস্যুর প্রশ্নে কিন্তু স্থানীয় পুরসভাগুলো বর্তমানে কাদের দখলে বা জিটিএ কাদের দখলে তা নিয়ে আলোচনা করাই মুখ্য হয়ে উঠবে। আর তা মোর্চার বিপক্ষেই যাবে। কেননা, এখন জিটিএ বা পুরসভা সব মোর্চার দখলেই রয়েছে। তৃণমূল তো ইতিমধ্যে সেই প্রশ্নে মোর্চার সমালোচনা করে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে নেমেছে। তার সঙ্গে বিজেপি যদি জোট না করে মোর্চার সমালোচনায় যায়, তবে তা মোর্চার অনুকূলে যাবে না। এর বাইরে আরও মোর্চা-বিরোধী অনেক দল রয়েছে পাহাড়ে। ফলে মে মাস বা তারপরে হতে যাওয়া জিটিএ ভোটে মোর্চা-বিরোধী অঙ্ক কিন্তু বেশ জোরদার। যদিও শিলিগুড়িতে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, পাহাড়ের ভোটে মোর্চার সঙ্গে তাঁদের সমঝোতা হয়েছিল বিগত লোকসভার ভোটে। পুর ভোট ও জিটিএ ভোটে সেইদিকটি দেখছেন তাঁদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ এস এল আলুওয়ালিয়া। অন্য দিকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার অন্যতম নেতা বিনয় তামাং বলেন, তৃণমূল কোথাও কিছু করতে পারবে না পাহাড়ে। চারটে পুরসভার চারটেতেই মোর্চার জয়জয়কার হবে। পাহাড়ে তৃণমূলের কোনও ভিতই নেই বলে দাবি করেন বিনয়বাবু। তাঁর প্রশ্ন, পাহাড়ে কি তৃণমূল গুন্ডামি করে পুর ভোটে জিততে চায়? তবে কী করে আগেভাগেই তৃণমূল নেতারা জয়ের বিষয়ে দাবি করছেন? আবার কালিম্পঙে গত বিধানসভা ভোটে ডঃ হরকা বাহাদুর ছেত্রীর জন আন্দোলন পার্টির সঙ্গে তৃণমূলের একটা অলিখিত জোট হয়েছিল। কালিম্পঙে কোনও প্রার্থী দেয়নি তৃণমূল। কালিম্পঙে রীতিমতো মোর্চাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন হরকা বাহাদুর। সেই জাপ-এর সঙ্গে অবশ্য ইদানীং তৃণমূলের সম্পর্কে কিছুটা হলেও চিড় ধরেছে। কালিম্পং কলেজে নির্বাচনের পর এক ছাত্র অপহরণ নিয়ে গোলমাল হয় তৃণমূল আর জাপ-এর মধ্যে। এর সুযোগ অবশ্য নেওয়া শুরু করেছে গুরুঙের দল।

> পাহাড়ের ভোট আর সমতলের ভোটের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পাহাড়ে ভোট হয় পুরো সেন্টিমেন্টের ওপর। বামেদের ৩৪ বছরের শাসনে ৩১ বছরই সেন্টিমেন্টের ওপর ভোট হয়েছে পাহাড়ে।

অন্তত পাহাড়ের অন্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গিয়েছে তা হল, পাহাড়ের ভোট আর সমতলের ভোটের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পাহাড়ে ভোট হয় পুরো সেন্টিমেন্টের উপর। বামেদের ৩৪ বছরের শাসনে ৩১ বছরই সেন্টিমেন্টের উপর ভোট হয়েছে পাহাড়ে। সেন্টিমেন্ট বলতে গোর্খাল্যান্ড। আর সেই গোর্খাল্যান্ডের উপর ভর করেই একসময় ঘিসিং আর সম্প্রতি গুরুং তাঁদের শক্তি দেখিয়েছেন। এবারেও পুর ভোট থেকে অন্য ভোটে গোর্খাল্যান্ড সেন্টিমেন্ট দিয়েই এগতে চাইছেন গুরুং ও তাঁর বাহিনী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই গোর্খাল্যান্ডের সেন্টিমেন্টে জল ঢেলে দিতে চাইছেন ঢালাও উন্নয়ন, পিছিয়ে পড়াদের জন্য পর্ষদ গঠন, নতুন জেলা ও নতুন মহকুমা গঠনের মাধ্যমে। যেখানে তৃণমূল সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল না, সেখানে প্রত্যেক এলাকাতে তৃণমূলের ভোট বৃদ্ধির হার উল্লেখ করার মতো। গত বিধানসভার ভোট তার উদাহরহণ। রাজ্যের কোনও রাজনৈতিক দলের পাহাড়ের ভোটে এইরকম সাফল্য অতীতে দেখা যায়নি। আর এটা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বারবার পাহাড়ে আসা, সেখানকার মানুষের বিপদে পাশে থাকার কারণে। তাদের সঙ্গে আন্তরিকতার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে শান্তি ও উন্নয়নের বিজয়রথ শক্ত করতে চাইছেন। শেষমেশ কী হবে তা তো সময়ই বলবে।

বাপি ঘোষ

পাঠকের ক্যামেরায়

এ কোন ডুয়ার্স?

জয়গাঁতে বিপন্ন তোর্সা

ভারত ও ভুটানের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁ শহরকে সম্প্রতি পৌরসভার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। দ্রুত নগরায়ণের কুফল কী হতে পারে, তার একটি ধ্রুপদী উদহারণ হল এই শহর, যেখানে ১০-১৫ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষের বসবাস। পুরো শহরাঞ্চলটি পয়ঃপ্রণালীবর্জিত (সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট) অবস্থায় রয়েছে, তা ছাড়া এখানে না আছে কোনও উপযুক্ত স্কুল, কলেজ বা হাসপাতাল। একটি মাত্র এনজিও এখানে কাজ করছে; তাদের কাজ হল শুধু বাজার এলাকা থেকে আবর্জনা তুলে তোর্সা নদীর পাড়ে ফেলে দেওয়া। পানীয় জলের জন্য কুয়ো হল সব থেকে সহজ উৎস। পুরো এলাকাটি একটি বৃহৎ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে, এবং জনস্বাস্থ্যর কথা একেবারেই ভাবা হয়নি।

কোথা থেকে হাজার হাজার লোক এসে নদীর পাড় দখল করে জনবসতি গড়ে

তুলেছে। এর ফলে নদীর পাড়, ঝোরা, চা-বাগান এলাকা জবরদখল হয়ে পড়ছে। জয়গাঁর ভৌগোলিক অবস্থান ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে এবং খরস্রোতা তোর্সা নদীর পাড়ে। পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে অসুরক্ষিত জায়গা হওয়া সত্ত্বেও এখানে

জনঘনত্ব মারাত্মক বেশি, কিন্তু কেন?

সীমান্ত শহর হওয়ার ফলে এখানে সব রকমের ব্যবসাবাণিজ্যই চলে— আইনি ও বেআইনি। স্বাধীনতার পর ৬৮ বছর কেটে গেলেও অতীতে কোনও সরকার এখানকার জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর দিকে কোনও মনোযোগ দেয়নি বা উন্নয়নের চেষ্টা করেনি, বিশেষ করে জয়গাঁতে। শুধুমাত্র পরিবেশ ও ভূসংস্থানের অবস্থাই নয়, এখানকার গরিব আদি বাসিন্দাদের (যারা মূলত তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের) অবস্থাও দিনে দিনে খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়েছে।

বহু বছর ধরে ভুটান থেকে ডলোমাইটের পলি এসে নদীখাতের জলধারণক্ষমতাকে কমিয়ে দিচ্ছে। একই সঙ্গে বসরা নদীর জলও ভীষণ দূষিত হয়ে পড়ছে, কারণ ভুটানের শিল্পাঞ্চল পাসাকা থেকে বিভিন্ন কারখানার দূষিত বর্জ্য এই নদীতে এসে পড়ে।

রাজ্য সরকারের পক্ষে নদীতে ড্রেজিং করা সম্ভব নয়, কারণ কেন্দ্রের পরিবেশমন্ত্রক থেকে এ ব্যাপারে বিধিনিষেধ জারি করা আছে। এর ফলে এই এলাকার নদীগুলোর গতিপথ অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে, আর প্রতি বছর হড়কা বানের ঘটনা বেড়েছে। এই অঞ্চলের গরিব মানুষের দুর্দশা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

স্বর্ণালি চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ জয়ন্ত সেন

ছবি: প্রতিবেদক

মহিলাদের স্বনির্ভর দলগুলি গ্রামের চেহারা পাল্টে দিতে পারে !

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

বাবা মূলত চাষবাস করতেন। অনেকগুলো ভাইবোন। ভাইদের পড়াশোনার ব্যাপারে পরিবারের যে চাপ ছিল, সেই তুলনায় বোনদের পড়াশোনার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। আর গাড়িয়ালটারি অঞ্চলের মেয়েদের পড়ার তেমন ব্যবস্থা তখন ছিল না। এখন কাছেই মেয়েদের জন্য আলাদা হাই স্কুল হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে একদিন পড়াশোনার পাঠ চুকল। তখন মাধ্যমিক পাশ করার সুযোগ হয়নি। তবে ক্ষোভ একটা ছিল— বই পড়াটা তখন অনেকটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। এমন সময় পাশের গ্রামের এক তরুণের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এল। কনে দেখতে দল বেঁধে কিছু মানুষজন এলেন। তাঁদের পছন্দ হল। বিয়েও হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। তখনও ১৬ বছর বয়স হয়নি। মেয়েটি ভেবেছিল পাত্রটিকে জিজ্ঞেস করবে— তার পড়াশোনার ইচ্ছেপূরণে সে সাহায্য করবে কি? সে প্রশ্ন মনেই থেকে গিয়েছিল, জিজ্ঞেস করা আর হয়ে ওঠেনি।

বাবা খুব একটা সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন না, শ্বশুরবাড়ির অবস্থাও একই রকম। বিবাহিত জীবনে পার্থিব সুখের প্রাচুর্য না থাকলেও শান্তির অভাব ছিল না। তাড়াতাড়ি বিয়ে মানে তাড়াতাড়ি সন্তানের আগমন। জীবনটা প্রায় ঘেঁটে গেল। বিয়ের আগে লেখাপড়ার প্রতি যে আকর্ষণ ছিল, তা অনেকটাই স্তিমিত। শ্বশুরবাড়িতে পাড়ার গৃহবধূদের একটা বড় আড্ডা ছিল। অভাবী মহিলাদের জীবনের নানা বঞ্চনার কথাই সেখানের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু।

সন্ধ্যা মেয়েটির নাম। সন্ধ্যা রায়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের গৃহবধূ। কিছু একটা করার প্রবণতা তখনও মনের এক কোণে বেঁচে আছে। ২০০৪ সালে এলাকার মহিলা পঞ্চায়েতের কাছে সন্ধ্যা শুনেছিল মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা। সচেতনতার কথা। জেনেছিল, একজন গরিব মানুষের সমস্যা সমাজ, সরকার—কেউ শুনতে রাজি নয়। তার উপর কৃপাপ্রার্থী হলে তো কথাই নেই। তাই গরিবদের দল বাঁধা দরকার। সন্ধ্যার লড়াই শুরু হল— সমর্থন যত পেল, বিরোধিতা তার কয়েক গুণ বেশি। সন্ধ্যারা দশজনে স্বয়ম্ভর দল তৈরি করল। দলের নাম হল 'মা লক্ষ্মী এসএইচজি'। সংসারের চাপ সামলে সময় বার করে দলের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে থাকে ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে। তারা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, নাথুয়াহাট শাখাতে দলের অ্যাকাউন্ট করে প্রতি মাসে সঞ্চয় করতে থাকল। আপদে-বিপদে বা ছোটখাটো অর্থকরী কাজে দল থেকে ধার পাওয়া গেল। প্রায় দেড় বছর পর ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা হল। সন্ধ্যার সন্তানরাও বড় হচ্ছে— সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে এলাকায় স্বনির্ভর দলের দাপট। দলের মিটিংটা আসলে ছিল গভীর আড্ডা, কিন্তু

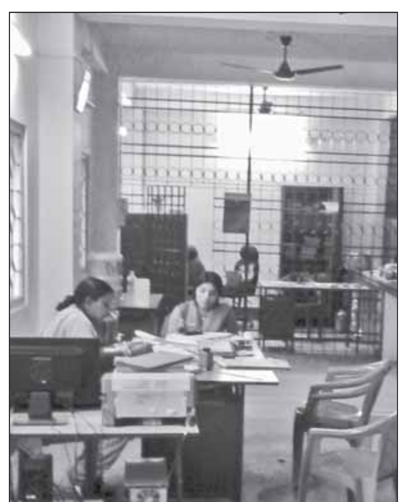

বাঁ দিকে উপরে: দলবলসহ ব্লকের মিটিং-এ প্রথম সারিতে সন্ধ্যা রায়। (মাঝে)
বাঁ দিকে নিচে: মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে পথের ধারে মহিলা সমাবেশ।
ময়নাগুড়িতে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণের অফিস।

সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির দিকে সর্বদাই ছিল প্রখর দৃষ্টি। দলের প্রত্যেকের সন্তান পড়াশোনা করছে, সদস্যদের বাড়িতে শৌচাগার ছাড়াও প্রত্যেকেই স্বাক্ষর। তারা পণ করেছে, এলাকার প্রতিটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, নাবালিকা বিবাহ নিষিদ্ধ। মহিলারা প্রত্যেকেই রোজগেরে গিন্নি। আসলে সবাই কৃষি পরিবারের প্রতিনিধি। ঋণের টাকার বেশিটাই কৃষিতে ব্যবহার হয়, তা ছাড়া মহিলারা ছোটখাটো ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত। অক্লেশে তারা ব্যাঙ্কে, গ্রাম পঞ্চায়েতে, ব্লক অফিস এবং জলপাইগুড়িতে কাজে যাতায়াত করছে। সন্ধ্যার ব্যস্ততাও বাড়ছে। শালবাড়ি-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সব ক'টা স্বনির্ভর দল মিলে তৈরি করেছে একটি সংঘ বা ক্লাস্টার, যা দুর্গা সংঘ নামে পরিচিত। ২০১২ সালের মে মাসে ধূপগুড়ি ব্লকের সংঘগুলো মিলে তৈরি হল মহাসংঘ। আসলে তার নাম 'ধূপগুড়ি ব্লক মহিলা মহাসংঘ'— দপ্তরটি তৈরি হয়েছে ডাউকিমারি হাটের একটি তিনতলা নিজস্ব বাড়িতে। দুর্গা সংঘের সম্পাদিকা এবং মহাসংঘের সম্পাদিকার দায়িত্বে সন্ধ্যা রায়। ধূপগুড়ি ব্লকের উইমেন ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিরুপমা রায় জানালেন, 'সন্ধ্যাদি একটা সুন্দর মনের মানুষ। দলের কাজে পরিশ্রম করেন, তা ছাড়া ওঁকে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। বর্তমানে মহাসংঘ একটি সমষ্টি বিত্ত সংস্থা বা সিএফআই পরিচালন করছেন।' এরা ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি ব্লকে আইসিডিএস প্রকল্পে পুষ্টিকর ছাতু সরবরাহ করে। এই ছাতু তৈরির জন্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি উৎপাদনকেন্দ্র নিজস্ব ভবনের নিচুতলায় চলছে। ওরা হাসপাতালে খাবার সরবরাহ বা বিডিও অফিস ক্যান্টিনে খাবার তৈরি ও পরিবেশন করে থাকে। বাৎসরিক মোট ব্যবসা কোটি টাকা ছুঁয়েছে। মহাসংঘ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালায়। সন্ধ্যা ও মহাসংঘের সভানেত্রী মমতা রায় একসঙ্গে ওদের টিম নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখন তারা রাজ্য সরকারের পক্ষে ন্যায্য মূল্যে ধান কিনছে এবং রাইস মিলকে সরবরাহ করছে। সন্ধ্যা ও তার দলবল মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এখনও অক্লান্ত। তাই যখন মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছে, তখন সেই সম্মান এলাকার সব স্বনির্ভর দলের বলে মনে করেছে। সন্ধ্যা বলছিল, এখন একঝাঁক নেত্রী তৈরি হয়েছে। আগামীতে হয়ত নতুন কারও হাতে দায়িত্ব সঁপে দিয়ে একটু নিজের জন্য সময় দিতে পারবে। তবে বিশ্রামের কথা আদৌ সে চিন্তা করছে না। অনেকটা পথ এখনও বাকি। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে যে দলটি তৈরি হয়েছিল তা আয়তনে বা

সংগতিতে বেশ বড়।

আর-একজন মহাসংঘের নেত্রী দীপালি রায়। ময়নাগুড়ি ব্লকের ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬টি সংঘ তৈরি করেছে— ময়নাগুড়ি ব্লক মহিলা মহাসংঘ, ব্লক অফিস সংলগ্ন বাড়িতে তাদের দপ্তর। ওই মহাসংঘের সম্পাদিকা দীপালি রায়, সঙ্গে তার ৩২ জনের টিম। সভানেত্রী অঞ্জলি রায় বসুনিয়া নবাগতা। দীপালির বাড়ি ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়ি-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে। এরা ধূপগুড়ি ব্লক মহিলা মহাসংঘ থেকে আইসিডিএস কেন্দ্রে সরবরাহের জন্য পুষ্টিকর ছাতু সংগ্রহ করে— সামান্য লাভে এই ব্যবসা চলছে। তাদের মহাসংঘ ভবনে নিয়মিত দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ চলে। মহাসংঘ নেত্রীরা হাওড়া থেকে 'হাত ধোয়ার তরল সাবান' তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে এবং বিদ্যালয়গুলোতে সেই সাবান সরবরাহ করছে। নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে স্কুলগুলোতে পোশাক তৈরি করে সরবরাহ করছে।

দীপালিও ছোটবেলা থেকেই নানা কষ্টের মধ্যে বড় হয়েছে। নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে। পড়াশোনার সুযোগ প্রায় ছিলই না। শ্বশুরবাড়িতেও কাজের চাপ এবং একটা পরিবারের দায়িত্ব সামলাতে হয়েছে। দীপালিরা দশজন মিলে প্রায় ১৩ বছর আগে দল তৈরি করেছে। ওদের দলের সঞ্চয় এখন প্রায় ৬০ হাজার টাকা। ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ পেয়েছে। সব সদস্যই নানা অর্থকরী কাজে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে। দীপালি এলাকার একজন পরিচিত সমাজকর্মী। নিজের এলাকার ২০০-র অধিক দল একসঙ্গে তৈরি করেছে সংঘ। এবং ব্লকের ১৬টি সংঘ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি নিয়ে তৈরি হয়েছে মহাসংঘ। দীপালি দশভুজা— বাড়ির সব কাজ সামলাতে হয়। তা ছাড়া সংঘের নানা কাজের চাপ সামলে তাকে মহাসংঘের জন্য সময় দিতে হয়। ময়নাগুড়ি ব্লক মহিলা মহাসংঘ একটি ব্যাঙ্ক চালায়— অর্থাৎ ক্ষুদ্র

উপরে: ময়নাগুড়ি ব্লক মহিলা মহাসংঘের দপ্তর। নিচে: বস্তা বোঝাই পুষ্টিকর ছাতু। আইসিডিএস কেন্দ্রে পাঠানো হবে।

ঋণদান সংস্থা পরিচালনা করে। গত আর্থিক বছরে স্বনির্ভর দলকে মহাসংঘ ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ছিল ৯৭ শতাংশ। নোটবন্দির অভিঘাতে তাদের ঋণের কাজে বাধা সৃষ্টি হয়। তবুও তারা শুধুমাত্র ব্যবসায় ৫ লক্ষ টাকা লাভ প্রত্যাশা করছে।

ধূপগুড়ি ব্লকের সন্ধ্যার বড় ছেলে এমএসসি পাশ করে প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ছোট ছেলে সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ে বিএ পড়ছে। আমাকে বলছিল, 'আমাদের কন্যাসন্তান থাকলে তাকে যত দূর সম্ভব লেখাপড়া শেখাতাম।'

দেখতে দেখতে সময় চলে যায়, দীপালির কন্যা বিএ পাশ করে চাকরির খোঁজ করছিল। একটি ভাল ছেলের সঙ্গে তার বিয়েও হয়ে গেল। দীপালি বলছিল, 'সারাদিন কত মানুষ কত দুঃখকষ্ট নিয়ে আমার কাছে আসে। তাদের জন্য হয়ত খুব সামান্য কিছুই করতে পারি, কিন্তু তারা বুকভরা ভালবাসা সঙ্গে নিয়ে ফিরে যায়।'

পূর্ব ডুয়ার্সের দুই ঠিকানা

সিসামারা

জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে জঙ্গল ঘেরা গ্রাম হল সিসামারা। জনপ্রিয় ও ব্যস্ত পর্যটনকেন্দ্রের থেকে দূরে নিরিবিলিতে যাঁরা ছুটি কাটাতে চান, তাঁদের জন্য সিসামারা এক আদর্শ টুরিস্ট ডেস্টিনেশন।

এখানকার কটেজে দুটো আরামদায়ক ঘর আছে। গরাদহীন কাচের জানালা, জঙ্গলমুখী খোলা বারান্দায় এসে বসলে ঘর ছেড়ে কোথাও বেরতে ইচ্ছে করবে না। বাতাসে যদি ভালবাসার ছোঁয়া থাকে, বলা যায় না, প্রকৃতিদেবী খুশি হয়ে বন্য প্রাণীর দর্শনও দিতে পারে আপনাকে, যারা নদীর অপর পারে জল খেতে আসে। আর এই সব কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে এই জঙ্গল কটেজের বারান্দা থেকে। সামনের ছুটিতে ঘুরে আসতে পারেন।

থাকার জায়গা: জলদাপাড়া রাইনো কটেজ

কাছের রেল স্টেশন: ফালাকাটা, মাদারিহাট

কাছের এয়ারপোর্ট: বাগডোগরা

বুকিং: ৯৮৭৪৪৩৯৫৭১

পানিঝোরা

বক্সা টাইগার রিজার্ভের কাছে পানিঝোরায় ডুয়ার্সের গ্রামীণ আতিথেয়তার স্বাদ পাওয়া যায়। এই গ্রাম পুরোপুরি জঙ্গল-ঘেরা। যাঁরা বক্সা ও জয়ন্তির কাছাকাছি জঙ্গলে থাকতে চান, সেইসব পর্যটকের জন্য রাজাভাতখাওয়া রেল স্টেশনের কাছে জঙ্গলের এই ঠিকানা আদর্শ বলে প্রমাণিত হবে। আদিবাসী, রাভা, গারো, মেচ প্রভৃতি জাতির মানুষ বাঙালিদের সঙ্গে তাদের পরম্পরাকে আগলে এখানে বসবাস করে। এদের রঙিন জীবনযাত্রা ও রীতিনীতি গবেষকদের পানিঝোরায় আকর্ষণ করে। জীবনধারণের জন্য এই বনবস্তির মানুষরা ধান, মকাই, মারুয়া প্রভৃতি শস্য চাষ করে, পাশাপাশি চলে বিভিন্ন সবজির চাষ।

থাকার জায়গা: 'লিটল হলিডে' হোমস্টে

কাছের রেল স্টেশন: আলিপুরদুয়ার

কাছের এয়ারপোর্ট: বাগডোগরা

বুকিং: ৯৮৭৪৪৩৯৫৭১

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

রাশিয়া ভ্রমণের পর আবার দিল্লির অলিন্দে ফিরে এলেন লেখক। রাজীব গান্ধি চাইছেন যুব কংগ্রেসকে ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। লেখকের গুরুত্ব বাড়ছে। কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সংকেত কীভাবে সাবধান করে দেয়, তার নমুনা দিতে গিয়ে লেখক টেনে এনেছেন তাঁর ভূত দেখার গল্প। জানিয়েছেন পবন শাহ নামক জনৈক 'অপয়া'র কথা। সেই প্রসঙ্গেই চলে আসে জলপাইগুড়ি থেকে বম্বে অধিবেশনে সদলবলে যোগ দিতে যাওয়ার কাহিনি। একদিকে রাজনীতি, অন্য দিকে অলৌকিক ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মিশেল— সব মিলিয়ে এই পর্ব নিয়ে এল ধারাবাহিক পাঠের ভিন্নতর স্বাদ।

।।৩০।।

ইতিমধ্যে রাজীবজি আমেথি থেকে লোকসভায় উপনির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। বিজয় ধর, অরুণ সিং তো ছিলেনই— আরও দু'জন নতুন ব্যক্তিত্ব যুক্ত হল, ক্যাপটেন সতীশ শর্মা ও অরুণ নেহরু। ধীরে ধীরে ২এ, মোতিলাল নেহরু মার্গ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল। এবং আমাদেরও গুরুত্ব বাড়তে শুরু করল। যুব কংগ্রেসকেই রাজীবজি নিজের লঞ্চিং প্যাড হিসেবে পছন্দ করাতে সার্বিকভাবে যুব কংগ্রেসেরও গুরুত্ব বাড়তে শুরু করল।

আমি ইতিমধ্যে হরিয়ানা ভবন ছেড়ে কার্জন রোড অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসেছি। ৪০৬ নং ফ্ল্যাট। পান্নিকর ছিল। কিন্তু পানিক্কর একদিন চাবি দিয়ে বলল, 'মিঠু, তুমি এই ফ্ল্যাটটায় থাকতে পারো।' একটা স্বতন্ত্র জায়গা পাওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই আমি যারপরনাই খুশি। এদিকে আজমেরি গেটে যার আস্তানায় ছিলাম, সেই পবন শাহ লোকটি ভাল, কিন্তু অসম্ভব অপয়া। ওর নিজের মুখে শোনা, ওর দুর্ভাগ্যের কাহিনি।

একদিন অন্ধকারে ওর পায়ে কিছু কামড়ে দিয়েছিল। ওর মনে হয়, সাপ কামড়েছে। ও পায়ে রশি বেঁধে হাসপাতালে গিয়ে ভরতি হল। যদিও ডাক্তারদের মনে হল, সাপ নয়, অন্য কিছু কামড়েছে, তবু অবজার্ভেশনে রাখার জন্য বললেন, 'দিন দুয়েক থাকুন। আমরা ক্ষতটার দিকে নজর রাখছি।' ও রাতে স্বপ্ন দেখল, ওর পায়ে আবার সাপ ছোবল মারছে। পা ঘুমের মধ্যে এমনভাবে ঝাড়ে, যে লোহার খাটের কোনায় লেগে পা কেটে পরে তা সেপটিক হয়ে যাওয়াতে এক মাস ওখানেই থাকতে হল। তারপর ব্যবসার জন্য বাংলাদেশে ৬০ লক্ষ ইটের বরাত পেয়ে ওখানে গিয়ে খুলনাতে ইটভাটা খুলেছিল। যে খুলনায় কোনও দিন বন্যা হয় না, পবন সেখানে ইটভাটা খোলবার পর অকালবর্ষণে প্রবল বন্যায় ওর সমস্ত কাঁচা ইট জলের তোড়ে ভেসে যায়। মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা মিথ্যে পরিচয়পত্র বানিয়ে 'পবন আও' নাম নিয়ে নাগাল্যান্ডের মকুকচুং জেলায় ব্যবসা করতে যায়। ক'দিনের মধ্যে সেখানে উপজাতি লড়াই শুরু হয়ে যায় 'আঙ্গামি' আর 'আও'দের ভিতর। পবন এক বস্ত্রে কোনওরকমে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচায়। ওর গল্প শুনে বুঝতাম, ওর মতো অপয়ার সঙ্গ ত্যাগ না করলে আমার ভাগ্যেও কিছু জুটবে না। তাই হরিয়ানা ভবন ছাড়ব শুনে ও খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ওর একটা ন্যায়সংগত প্রত্যাশা ছিল, দুর্দিনে আমি থাকতে দিয়েছি, আর সুদিনে আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে! তাই আমার কার্জন রোডে যাওয়াটা ওর একদম পছন্দ ছিল না।

আমি ওকে বললাম, চলো তোমাকে ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে নিয়ে আসি। ও এল। ফার্নিশড ফ্ল্যাট। দু'কামরার। একটা বসবার, একটা শোবার। সে সময় দিল্লিতে পূর্ণিমা সিং কেস নিয়ে খুব তোলপাড় হয়েছিল। পূর্ণিমা সিং কার্জন রোড অ্যাপার্টমেন্টের কোনও একটা ফ্ল্যাটে থাকত। পাঞ্জাবের কংগ্রেস এমপি মিস্টার গরচার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। তার টানাপোড়েনে একদিন চারতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পূর্ণিমা আত্মহত্যা করে। গরচা তারপরে আর কোনও দিন দলের মনোনয়ন পায়নি। কোন ফ্ল্যাটে পূর্ণিমা

সিং থাকত, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম না।

পবন আর আমি বসে গল্প করছি। আমি সোফায়, ও খাটে। হঠাৎ খাটের কোনা থেকে একটা লম্বা চুল টেনে বার করে বলল, 'দাদা, ইয়ে কেয়া হ্যায়?' আমি বললাম 'চুল, আবার কী!' ও বলল, 'না, আমার ঠিক ভাল লাগছে না।' আমি বুঝলাম, আমার চলে আসাটা ওর পছন্দ হয়নি, তাই একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করছে। খানিক পরে ও 'যাই' বলে রওনা দিয়ে ঘরের দরজার পাশে যে কুলুঙ্গিটা ছিল, সেটায় হাত রেখে কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা মেয়েদের চুলের কাঁটা তুলে বলল, 'এই দেখো, এটাও পেলাম। না, আমার এই জায়গাটা একদম ঠিক মনে হচ্ছে না।'— বলে আর কালবিলম্ব না করে 'চলি' বলে নিমেষে গায়েব হয়ে গেল। আমি একটু হতভম্ব হয়ে বসে থেকে, ওর পিছন পিছন গিয়ে ডাকার চেষ্টা করে দেখি, ও নিচে হুস করে গাড়িটা নিয়ে চলে গেল। আমি মহাফাঁপরে। থাকতেও ভয় লাগছে, আবার আজমেরি গেটও যেতে পারব না। কারণ এই রাতে এই অঞ্চল থেকে কোনও ট্যাক্সি বা স্কুটার ওদিকে যাবে না— এটা আমার জানা। থাকতেই যখন হবে, তখন ঠিক করলাম, বেডরুমটায় শোব না। পাশের ঘরে যে ডিভানটা আছে, তাতে শোব। তা-ই করলাম।

আজও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। মাঝরাতে আমি দেখছি, খোলা চুলে আমার মাথার কাছে গোলপানা মুখের ফরসা একজন মহিলা হাপুসনয়নে কাঁদছে, আর তার চোখের জল আমার কপালে টপটপ করে পড়ছে। আমি চিৎকার করে 'কে, কে' বলতে চাইছি, গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরচ্ছে না। বোবায় ধরেছে। যখন অনেক কষ্টে এক ঝটকায় উঠে বসে লাইটটা জ্বালিয়েছি, কোথাও কিছু নেই, সব ঠিকঠাক আছে। কিন্তু রাতে আর ঘুমাব না ঠিক করলাম। একটা শারদীয় সংখ্যা ছিল, তাতে রমাপদ চৌধুরীর 'স্বজন' বলে একটা উপন্যাস পড়ে রাতটা শেষ করে ভোরবেলা ঘুমালাম। যদিও পরে বুঝেছি, গোটা ব্যাপারটাই 'হ্যালুসিনেশন' ছিল, কিন্তু তারপরে আর কোনও দিন একা শোয়ার ঝুঁকি নিইনি। কেউ না কেউ কলকাতা থেকে বা জেলা থেকে আসতই। তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাতে রেখে দিতাম। তারপর বিক্রম বলে একটা কাজের ছেলে পাওয়ার পর এই সমস্যার সমাধান হয়েছিল।

কিন্তু ব্যবস্থাটা যে স্থায়ী নয়, সেটা জানা গেল যখন সিপিডব্লিউডি থেকে চিঠি এল ঘর খালি করবার নোটিশ দিয়ে। তখন খোঁজ নিয়ে জানলাম, পানিক্কর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লার নামে গেস্ট অ্যাকমডেশন হিসাবে এই ফ্ল্যাটটা নিয়েছিল। কিন্তু তারপর ও নর্থ অ্যাভিনিউতে ৯৪ নম্বর বাড়িটা যেন কী করে পেয়ে যায়। ফলে কার্জন রোডের ফ্ল্যাটটা আমায় থাকতে দিয়ে দেয়। এক মাসের নোটিশ ছিল। ইতিমধ্যে আনন্দ ৭০ সাউথ অ্যাভিনিউ জোগাড় করে ফেলেছে। একদিন বলল, 'দাদা, বাড়িটায় অনেক ঘর। আমরা সবাই মিলে থাকতে পারব।' তিন কামরার বাড়ি। ফার্স্ট ফ্লোর। নিচে

আমার একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। যখন কলকাতায় '৭৭-এর দিনগুলো কোনওরকমে পার করছি, তখন সিআইটি-র ফ্ল্যাট থেকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে ফুটপাথের দোকান থেকে বেঞ্চে বসে সকালবেলা পুরি-সবজি খেতাম। একদিন খেতে শুরু করেছি, তাকিয়ে দেখি উলটো দিক থেকে একটা বিরাট ষাঁড় আসছে।

বিজেপি-র এমপি স্বামী ইন্দ্রবেশ থাকতেন। ওপরে এক ঘরে আনন্দ, এক ঘরে আমি আর এক ঘরে অরুণ সিং (মুন্না)। মুন্নার ভূতের ভয় ছিল বলে ও নিজের ঘর ছেড়ে আমার বিছানায় এসে পাশে শুয়ে পড়ত। প্রতি রাতে নেশা করে আসত আর বেলা পর্যন্ত ঘুমাত। আমি ইরাক থেকে একটা টেপরেকর্ডার নিয়ে এসেছিলাম। তাতে পতঞ্জলির একটা ভজনের ক্যাসেট মুন্নার খুব প্রিয় ছিল। আমি সকাল সকাল তৈরি হয়ে নেতা দর্শনে বেরিয়ে পড়তাম। আর মুন্না বিছানায় শুয়ে শুয়ে পতঞ্জলির ক্যাসেটটা চালিয়ে গানটা শোনাত— 'ভিখারি সারে দুনিয়া— দাতা এক রাম'। 'দাদা, কহাঁ জা রহে হো? সুন নহি পা রহে হো, গানা মে কেয়া বোল রহা হ্যায়? সারে ভিখারি হ্যায়, কিসিসে ভি মিলকে কুছ নহি মিলেগা।' আমি বলতাম, 'কিছু চাইতে তো যাচ্ছি না। এমনিই দেখা করতে যাচ্ছি।'

একদিন বিকেলবেলায় ফিরছি। স্বামী ইন্দ্রবেশজি রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে বললেন, 'তোমরা কংগ্রেস করো, তবু তোমাদের এত প্রভুভক্তি। আমি সত্যিই মুগ্ধ। রোজ সকালবেলা তোমাদের ঘরের ভজন শুনে আমার মনটা পবিত্র হয়ে যায়।' মনে মনে ভাবলাম, যে বাজায়, তাকে যদি কখনও রাতে ফিরতে দেখতেন তাহলে বুঝতেন, গান যে বাজায়, তার আসল রূপটা কী।

যা-ই হোক, আমি ৭০ সাউথ অ্যাভিনিউতে আসব আসব করছি, পানিক্কর একদিন বলল, 'মিঠু, আমার শালা হিন্দুস্থান টাইমস-এর রিপোর্টার, দিল্লি ট্রান্সফার হয়ে এসেছে। ওকে তুমি ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দাও।' আমি ইভিকশন নোটিশের কথাটা চেপে গেলাম। বললাম, 'নিশ্চয়ই, আমারও ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আনন্দ ৭০ সাউথ অ্যাভিনিউ নিয়েছে। আমি ওখানে চলে যাচ্ছি। কাল তোমায় চাবি দিয়ে দেব। আমি কৃতজ্ঞ যে, এতদিন তুমি থাকতে দিলে।' শশাঙ্ক ভদ্রলোকের নাম। সাত দিনও থাকেনি। একদিন দুপুরবেলা যুব কংগ্রেস অফিসে ফোন করে আর্তনাদ করে বলতে লাগল, 'এটা কী হচ্ছে? সিপিডব্লিউডি-র লোকেরা এসে আমার সমস্ত জিনিসপত্র বাইরে ফেলে দিচ্ছে।' আমি বললাম, 'এক্ষুনি পানিক্করকে খবর দিচ্ছি। কেন এমন হল, ও অবশ্যই দেখবে।' জানতাম, যা ঘটবার ছিল তা-ই ঘটল। একবার রাইটারস'-এর সামনে পুলিশের লাঠির থেকে বেঁচেছিলাম, এবার উচ্ছেদের হাত থেকে বেঁচে গেলাম।

আমার একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। যখন কলকাতায় '৭৭-এর দিনগুলো কোনওরকমে পার করছি, তখন সিআইটি-র ফ্ল্যাট থেকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে ফুটপাথের দোকান থেকে বেঞ্চে বসে সকালবেলা পুরি-সবজি খেতাম। একদিন খেতে শুরু করেছি, তাকিয়ে দেখি উলটো দিক থেকে একটা বিরাট ষাঁড় আসছে। আমি কাউকে কিছু না বলে বেঞ্চ থেকে উঠে গিয়ে উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে খেতে লাগলাম। ষাঁড়টা এসে বেঞ্চে যতজন বসে খাচ্ছিল, সকলেরই হাতের পুরি এক-এক করে খেয়ে চলে গেল। রাজনীতিতে সারাজীবনই নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়েছে। তাই ভগবান বোধহয় একটা ইন্দ্রিয় খুব সজাগ করে দিয়েছিল, যাতে সব পরিস্থিতিতে বিপদ যেন আগেই আঁচ করতে পারি। তাই ছাত্র পরিষদ যখন করি, তখনও একবার অন্তিদার প্রেরণায় দলের যুব ছাত্ররা খগেনবাবুর গোষ্ঠীর হয়ে ফালাকাটায় কংগ্রেস সম্মেলনে যখন গেল, মেজদা (বাবলুদা) বলল, 'তুই যাবি না?' আমি বললাম, 'আমার আজ কলেজে একটা মিটিং আছে, এবারের প্যানেলটা ফাইনাল করতে হবে, তাই কোনও উপায় নেই, থাকতেই হবে।' বিকেলে মেজদা ফিরে এসে বলল, 'তুই বোধহয় বুঝতে পেরেছিলি গোলমাল হবে। তাই যাসনি।' আমি বললাম, 'কেন, কী হয়েছে?' ও বলল, 'আমরা সবাই অতুল্য ঘোষকে বিক্ষোভ দেখিয়ে চলে এসেছি। নিত্যদাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে দল থেকে ছ'বছরের জন্য বার করে দিয়েছে।' আমি মনে মনে বললাম, তাহলে আমার আশঙ্কাই

বেড়াতে চলুন আন্দামান

গ্রুপ টুর
যাত্রা শুরু
২১ মে ২০১৭
(পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পোর্ট ব্লেয়ার)
আসন সীমিত

৭ রাত ৮ দিনের প্যাকেজ টুর

পোর্ট ব্লেয়ার	-	৪ রাত
হ্যাভলক	-	২ রাত
নীল	-	১ রাত

প্যাকেজ রেট
১৭,৮৫০ টাকা (জন প্রতি)
১৬,৯০০ টাকা (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৪,৩০০ টাকা (৫-১১ বছর)
৮,৯০০ টাকা (২-৪ বছর)
(দ্রষ্টব্য: বিমান ভাড়া ব্যতীত প্যাকেজ রেট)

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
সাইট সিইং, পরিবার প্রতি ঘর, নন-এসি গাড়ি, খাওয়া (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার), সরকারি বোট, সকল পারমিট

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office: Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866

দলীয় কর্মীদের সঙ্গে প্রশিক্ষণ শিবিরের ক্যান্টিনে বাসুদেব পানিক্কর (ভোজনরত) ও দেবপ্রসাদ রায়

ঠিক হল!

পুরনো এমনি একটি ঘটনা। এখনও শোনালে অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না। বেলাকোবা স্কুলে চাকরি করাকালীন বম্বে অধিবেশনে আমরা ছ'জন গিয়েছিলাম, আগেই বলেছি। আমি, রাতুলদা, হীরকদা, মানবদা, কালী গুহ ও বৈদ্য দত্ত। তখন কোনও সরাসরি রুট ছিল না। রিজার্ভেশনেরও কোনও বালাই ছিল না। শিলিগুড়ি থেকে একটা ট্রেনে বারাউনি, তারপর স্টিমারে পার হয়ে মোকামা থেকে আর-এক ট্রেনে কানপুর, সেখান থেকে আরও একটা ট্রেন ধরে বম্বে। কোন ট্রেনটার কী নাম ছিল তা-ও মনে নেই। যা-ই হোক, কোনওরকমে কানপুর অবধি তো যাওয়া হল। তারপর যে ট্রেনটা বম্বে যাবে বলে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে তিলধারণের জায়গা নেই। হঠাৎ হীরকদা একটা তুলনামূলকভাবে ফাঁকা কামরা দেখে বলল, 'সবাই এটায় ওঠো।' সর্বাগ্রে হীরকদা। যত দ্রুততার সঙ্গে উনি উঠলেন, তত দ্রুততার সঙ্গেই উনি কামরা থেকে নিক্ষিপ্ত হলেন। উনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শালা ধাক্কা মারতা হ্যায়।' বলে সামনে যে লোকটি, তার পেটে একটা ঘুসি মেরে বসলেন। আর যায় কোথায়, পিলপিল করে সব যাত্রী নেমে এসে হীরকদার হাত এমনভাবে মুচড়ে ধরে পিঠে কিল মারতে শুরু করল, যে রাতুলদা না ঝাঁপিয়ে থাকতে পারল না। ফলে সে-ও প্রহৃত হল। আমি প্ল্যাটফর্মের নিরপেক্ষ লোক হয়ে রেলের লোকদের টেনে আনতে লাগলাম এই বলে যে, মারপিট লেগেছে, ছাড়িয়ে দিন। শেষ অবধি থামল। এবং জানা গেল, এক বিয়ের পার্টি পুরো কামরাটা রিজার্ভ করে যাচ্ছে। তাই সেখানে অন্যকে উঠতে দেবার কোনও প্রশ্নই নেই। যা-ই হোক, কোনওভাবে অন্য কামরায় উঠতে তৈরি হয়েছি, কালীদা নেই। খোঁজ খোঁজ। দেখা গেল, ওভারব্রিজের নিচে গিয়ে লুকিয়ে আছে।

ফেরবার পথে আর-এক কাণ্ড। এবার কপালগুণে ট্রেনটা মোটামুটি খালি বললেই চলে। তবে বার্থ সব দখল হয়ে আছে। বুঝলাম, শোয়া যাবে না, তবে বসে ভালভাবেই যাওয়া যাবে। আমরা যে কামরায় উঠেছি, তার লাগোয়া কামরা থেকে মানবদা বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে এল। জানতে চাইলাম, 'কী ব্যাপার?' বলল, 'ছ'জন বাঙালি থাকা সত্ত্বেও একজন সর্দার আমার গায়ে হাত তুলল, কেউ কিছু বলবে না!' আমি বললাম, 'আমি দেখছি।' পাশের কামরায় যে বাঙ্কটিতে সর্দারজি শুয়ে আছে, তার সঙ্গে ভাব জমালাম। এ কথা-সে কথার পর জানতে চাইলাম যে, বাঙালি লোকটির সঙ্গে কী হয়েছিল। ও বলল, 'ও এত বেয়াদব যে, আমি বারবার বলছি, আমি সন্ধেবেলা নেমে যাব, তা-ও খালি বলছে, তোমার আগে এই বাঙ্কটা আমি টার্গেট করেছি, তাই আমি এখনই দখল করব। তাই আমি ওকে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছি।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে। তুমি নামলে আমি নেব।' ও বলল, 'এটাই ওকে বোঝাতে চাইলাম। ও বুঝতে রাজি নয়।' যথারীতি সর্দারজি নামার পর আমি উঠে পড়লাম। রাত হতে একবার মানবদা উঁকি মারতে এসে দেখে ওই বাঙ্কে আমি শুয়ে আছি। বলল, 'তুমি নামো। আমি এটার জন্য মার খেয়েছি, আর তুমি শুয়ে আছ!' আমি বললাম, 'দাদা, যে যার ভাগ্যে শোয়। আমার কপালে ছিল। তাই পেলাম। ওর কথা শুনলে আপনিই পেতেন।' মানবদা রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।

তবু নাটকের আরও একটু বাকি ছিল। ট্রেনটা যখন মোগলসরাই এসে দাঁড়াল, তখন রাত সাড়ে এগারোটা। ওই রাতে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হীরকদা এক হকারের কাছ থেকে একটা চাকু কিনলেন। তারপর সকলকে দেখিয়ে বললেন, 'এবার যদি কোনও মারামারি হয়, তবে চাকু চালিয়ে দেব।' বুঝলাম, যাওয়ার পথে কানপুরের প্রহারটা এখনও ওঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

(ক্রমশ)

তিরানব্বইয়ে পৌঁছেও বিষ্ণুপ্রিয়া পাল নিপুণ হাতে আঁকেন লক্ষ্মীর পট

কোচবিহার শহরের ২০ নং ওয়ার্ডের কুমোরটুলি। জেলার নামকরা মৃৎশিল্পীদের বাস এই এলাকায়। এখানেই দেখা পাওয়া গেল কোচবিহার, সম্ভবত ডুয়ার্সের সব চাইতে প্রবীণা মৃৎশিল্পী বিষ্ণুপ্রিয়া পালের। বয়স যাঁকে এতটুকুও কাবু করতে পারেনি। ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বিশ্রামের সঙ্গে যাঁর তেমন কোনও সখ্য নেই। ফোকলা দাঁতের হাসি দিয়ে বললেন, 'কাজ না কইরা থাকতে পারি না।'

দিন-মাস-বছরের হিসেবটা কিছুটা গুলিয়ে গেলেও আজও জীবনীশক্তিতে ভরপুর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। পূর্ববঙ্গের ঢাকায় (অধুনা বাংলাদেশ) বাবা শরৎ পালের ছিল কাঁসা-পিতলের ব্যবসা। ভাইবোনদের সঙ্গে পুতুল খেলতে খেলতেই মাত্র ১১ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় তাঁর। শ্বশুরমশাই

'ডুয়ার্সের ডিশ'। এবার থেকে ডুয়ার্সের রাঁধুনিরা হাজির করবেন রন্ধনশৈলীর নানা এক্সপেরিমেন্ট। সূচনা করলেন **শ্রাবণী চক্রবর্তী**, যাঁর হাতের রান্নায় মমত্ব ও জাদু দুই-ই আছে। আপনিও আপনার উদ্ভাবনী রন্ধনশৈলীর পরিচয় দিতে পারেন আকর্ষণীয় কোনও রেসিপি পাঠিয়ে। মেল করুন 'এখন ডুয়ার্স'-এর ই-মেল আইডি-তে।

তেল-ঝালে শুঁটকি মাছ

উপকরণ: লটে শুঁটকি মাছ ২৫০ গ্রাম; পেঁয়াজ কুচানো ২৫০ গ্রাম; রশুন বাটা ১০০ গ্রাম; কাঁচালংকা কুচানো ৫০ গ্রাম; টম্যাটো ২টো (বড়); শুকনো লংকা বাটা ২ বড় চা-চামচ; হলুদ গুঁড়ো আধ চা-চামচ; নুন স্বাদ অনুসারে; সরষের তেল ১৫০ গ্রাম; জিরে ১ চিমটে; শুকনো লংকা (গোটা) ৩/৪টি।

প্রণালী: মাছগুলো এক ইঞ্চি সাইজে কেটে নুন-জল দিয়ে প্রথমে ভাল করে ধুয়ে নিন। তারপর প্রেশার কুকারে একটা সিটি দিয়ে আবার মাছটাকে ধুয়ে নিন ও মাছের মাঝখানের কাঁটা ফেলে দিন। কড়াইতে একটু সরষের তেল দিয়ে নুন-হলুদ মাখা মাছগুলোকে ভেজে নিন। তারপর শিল পাটায় মাছ ভাজাগুলো আধবাটা করে বেটে নিন। এবার কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে সাদা জিরে, শুকনো লংকা ও কাঁচালংকা ফোড়ন দিয়ে কুচানো পেঁয়াজ তেলে দিন। পেঁয়াজে মোটামুটি বাদামি রং এলে রশুন বাটা, কাঁচালংকা, টম্যাটো কুচি দিন। কিছুক্ষণ ভাজা হওয়ার পর হলুদ, শুকনো লংকা বাটা ও নুন দিন। মশলা কষাতে থাকুন। যখন মশলা থেকে তেল বার হবে, তখন ওই আধবাটা শুঁটকি মাছ ওই মশলাতে দিন ও কষতে থাকুন। পুরো রান্নাটা কিন্তু আঁচে রান্না করবেন। পাঁচ মিনিট রান্না করার পর আঁচ বন্ধ করুন ও কড়াই ঢাকা অবস্থাতেই কিছুক্ষণ রাখুন। গরম ভাতে খান। যাঁরা কোনও দিন এই মাছ খান না, একবার খেতে চেষ্টা করুন। যে গন্ধের ভয়ে আপনি খান না, ওই গন্ধ আপনি পাবেন না, আর খেতেও ভীষণ ভাল লাগবে।

> শ্বশুরের কাছেই প্রথম মাটির পুতুল বানানো শেখে ছোট্ট বউমাটি। সেই থেকে শুরু। সেই বয়সে রান্নাটাও ঠিকঠাক গুছিয়ে না করতে পারায় শাশুড়ির গঞ্জনার হাত থেকে সস্নেহে আড়াল করতেন শ্বশুরমশাই। বউমাকে শেখাতেন নানান ধরনের পুতুল বানানো, মূর্তির হাত-পা বানানো, বিভিন্ন প্রতিমা রং করা, তার সাজসজ্জার সরঞ্জাম তৈরি করা ইত্যাদি।

যতীন্দ্রমোহন পাল ছিলেন ঢাকারই একজন নামকরা মৃৎশিল্পী। শ্বশুরের কাছেই প্রথম মাটির পুতুল বানানো শেখে ছোট্ট বউমাটি। সেই থেকে শুরু। সেই বয়সে রান্নাটাও ঠিকঠাক গুছিয়ে না করতে পারায় শাশুড়ির গঞ্জনার হাত থেকে সস্নেহে আড়াল করতেন শ্বশুরমশাই। বউমাকে শেখাতেন নানান ধরনের পুতুল বানানো, মূর্তির হাত-পা বানানো, বিভিন্ন প্রতিমা রং করা, তার সাজসজ্জার সরঞ্জাম তৈরি করা ইত্যাদি। স্বামী নিত্যগোপাল পাল সারা বছরই প্রায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন মূর্তি বানানো আর মূর্তি বিক্রি করার জন্য। তাই বিয়ের পর স্বামীকে সেভাবে কাছেও পাননি বিষ্ণুপ্রিয়া। হঠাৎই ৬/৭ বছর বাদে সেই সুযোগ আসে। কাজের খোঁজ পেয়ে ঢাকা ছেড়ে কোচবিহারে চলে আসেন তাঁর স্বামী, সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াও। শুরু হয় নতুন পরিবেশে নতুন সংসার। কোচবিহারে তখন খুব বেশি পুজো হত না। তখন রাজার আমল। তবুও মূর্তির বায়না পেতেন তাঁরা, বায়না আসত আসাম থেকেও। এরই মধ্যে দেশ স্বাধীন হল। তিন ছেলে, পাঁচ মেয়ের মা হলেন তিনি। সংসার সামলে শ্বশুরের কাছে শেখা পুতুল, বর-বউ বানাতেন তিনি। কোচবিহারের রাসমেলায়, রথের মেলায় সেগুলো বিক্রি হত। ততদিনে ভাড়া বাড়ি থেকে নিজেদের ছোট্ট একটা বাড়ি বানিয়েছেন তাঁর স্বামী। এভাবেই বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই সুখ বেশি দিন স্থায়ী হল না। হঠাৎই স্বামী মারা গেলেন। ছোট সন্তানদের নিয়ে সে সময় অথই জলে পড়ার অবস্থা। বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সংসারের হাল ধরতে হল তাঁকে। মূর্তি বানানোর জন্য কলকাতা, আলিপুরদুয়ার থেকে কারিগর আনিয়ে কাজ করানো হত। সেই অসময়ে নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেছেন পড়শি রমেশচন্দ্র পাল, কোচবিহারের অন্যতম মৃৎশিল্পী তিনি। সেই সাহায্যের কথা আজও মনে রেখেছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। সে সময় প্রতিমার বায়না ধরা, চিলাখানা থেকে মাটি আনানো, কাজ দেখাশোনা করা, প্রতিমা রং করা— সবটাই নিজে করতেন। একটাই আক্ষেপ ছিল যে, কাঠামো গড়তে পারতেন না। তবুও একটা দিনের জন্যও কাজ বন্ধ হতে দেননি। মহিলা বলে অনেকে খরিদ্দার ভাঙিয়ে নিতে চাইত। কিন্তু কারিগররা সে সময় খুব সাহায্য করায় পরিস্থিতি হাতের বাইরে যায়নি। সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে আজও কষ্ট হয় তাঁর। কোথা থেকে এত মনের জোর, এত শক্তি পেয়েছিলেন জানেন না। তবে দমবার পাত্রী ছিলেন না তিনি। ছেলে বাদল বড় হয়ে কাজ শেখায় পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। পরে মেজ ছেলে প্রদীপও কাজ শিখে নেয়। এখন বাদল পালের তৈরি মূর্তি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যথেষ্ট সমাদৃত। জানালেন, 'সবটাই মায়ের জন্য। অনেক কাজ শিখেছি মায়ের কাছে। সেই সময় মা যেভাবে সবটা সামলেছেন তা বলার নয়। আজও, এই ৯৩ বছর বয়সেও আমাদের সাহায্য করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন পুজোর আগে কাজের চাপ পড়লে মা মূর্তি রং করা থেকে শুরু করে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেন।'

এখন তাঁর কারখানায় দুই ছেলে বাদে দশজন কারিগর খাটে। আগের চাইতে অনেক বড় হয়েছে তাঁর কাজের জায়গা। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন ভালভাবে। ছেলে-বউ-নাতি-নাতনি নিয়ে এখন ভরা সংসার তাঁর। এই বয়সেও ভোরবেলা উঠে সবার আগে সংসারের বাসি কাজ সেরে রাখেন তিনি। বউমাদের সাহায্য করেন প্রয়োজনমতো। কোনও সময় রান্নাও করেন। ঠাকুর পুজোও তাঁকেই দিতে হয়। তাঁর কথায়, 'আমি বয্যা থাকতে পারি না।' একটা চোখে ছানি অপারেশন করানো হলেও তা সফল হয়নি। তাই সেই চোখের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা ক্ষীণ। তবুও হারার পাত্রী তিনি নন। জানান, 'আমার তাতে কাজ করতে কোনও অসুবিধা হয় না।' আজও নিপুণ হাতে আঁকেন লক্ষ্মীর পট। ছাঁচের প্রতিমা রং করেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, অষ্টনাগসহ নানান মূর্তি রূপ পায় তাঁর হাতে। তবে এই কাজে তাঁর একমাত্র নাতির কোনও আগ্রহ নেই। কোনও বউমাও কাজ শিখল না। ছেলেদের পর এই কাজ ধরে রাখার আর কেউ থাকবে না। এতক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কথায়।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

অত্যাচারিতা নির্যাতিতা মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে 'সৌমি'র আত্মপ্রকাশ

সৌমি (শিলিগুড়ি অর্গানাইজেশন ফর উইমেন'স ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স)— এই নামে সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করল দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায়, যার মূল কান্ডারি মিলি সিনহা ও শ্রাবণী চক্রবর্তী। এই সংগঠনের মূল কাজটাই হল অবহেলিতা, অত্যাচারিতা, নির্যাতিতা মহিলাদের পাশে দাঁড়ানো, সঙ্গে শহর-গ্রামের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিভাকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে আনা ও চা-বাগানগুলোতে নানান আইনি সহায়তা করা। এমন সব নানান কর্মকাণ্ড নিয়ে তৈরি হল 'সৌমি'। দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার সবুজ সংঘের মাঠে প্রায় শ'দেড়েক শিল্পীর সমন্বয়ে পুরো মাঠ প্রদক্ষিণ, সঙ্গে 'ওরে গৃহবাসী' গানের তালে তালে। নানান

রংবেরঙের ভেষজ আবিরে একে অপরকে রাঙিয়ে মাঠের উপর মূলমঞ্চে শুরু হল জমজমাট তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠান। মাঠ ভরতি দর্শক-শ্রোতাকে মাতিয়ে দিল নাচে, গানে, কবিতায়। যেন একটা শান্তিনিকেতন নেমে এল সবুজ সংঘের মাঠে। শিলিগুড়ির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, নাচ, গান, কবিতার স্কুলগুলো এসে সমবেত অনুষ্ঠানটিকে করে তুলেছিল বর্ণময়। এই মঞ্চের নামকরণ হয়েছিল 'কালিকাপ্রসাদ মঞ্চ'। একে একে অনুষ্ঠানে নিবেদন করলেন নৃত্য মল্লার, নৃত্য কুঞ্জ, কথা ও কবিতা, নৃত্য মঞ্জিল মিউজিক অ্যাকাডেমি, সৃজনী ডান্স অ্যাকাডেমি, স্পন্দন, কণ্ঠস্বর, নৃত্য মন্দিরম নটরাজ, নৃত্য নিকেতন-এর ছাত্রছাত্রীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সুদীপ চৌধুরী ও পারমিতা বিশ্বাস। স্থানীয় কয়েকশো দর্শক-শ্রোতা সাক্ষী হয়ে থাকলেন 'সৌমি'র আত্মপ্রকাশের রঙিন দিনটিতে। সংগঠনকে উৎসাহ দিতে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব মহাশয়। তাঁকে সংগঠনের কচিকাঁচারা আবির মাখিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। এইভাবেই শুরু হল মিলিদেবী ও শ্রাবণীদেবীদের মতন আরও অনেক মহিলার স্বপ্নের উড়ান।

নিজস্ব প্রতিনিধি

পুরস্কৃত হলেন অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

মার্চ ১৮, ফেসবুকটা অন করতেই শেয়ারিং পোস্টটা চোখে পড়ে গেল— 'এই বছর প্রথম মল্লিকা সেনগুপ্ত পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে তিন তরুণ কবিকে, তাঁরা হলেন সৌভিক ব্যানার্জি, পায়েল সেনগুপ্ত এবং অনিন্দিতা গুপ্ত রায়'। আনন্দ সংবাদটা পাওয়ামাত্র সন্ধেবেলায় একটা 'বোকে' নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম শুভেচ্ছা জানাতে কবি অনিন্দিতা গুপ্ত রায়ের বাড়িতে। কারণ উল্লিখিত পুরস্কারপ্রাপ্ত তিন কবির মধ্যে উনিই ছিলেন আমার প্রতিবেশী।

সেই সন্ধ্যায় তাঁর মুখোমুখি বসে অনেকটাই সমৃদ্ধ হলাম।

কবি অনিন্দিতা গুপ্ত রায় জলপাইগুড়ির বাসিন্দা, কবির জন্ম ও বেড়ে ওঠা মালদহ জেলায়। জন্ম ৮ মে। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর, পেশায় শিক্ষিকা। কথায় কথায় জানা গেল, বিদ্যালয়জীবন থেকেই তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। মূলত কবি হলেও রম্যরচনা, আলোচনামূলক প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বহুল প্রচারিত মাধ্যমে।

আলাপচারিতায় জানা গেল, তিনি এর আগেও বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন প্রদত্ত সম্মান পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু 'মায়া এঞ্জেল্যু-র কবিতা ভাষান্তর'-এ কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত পুরস্কার পাওয়াটা তাঁর কবিজীবনের স্বপ্নকে সার্থক করে দিল। এ এক চরম আনন্দলাভ।

২৬ মার্চ মধুসূদন মঞ্চে কবি শঙ্খ ঘোষের হাত থেকে গ্রহণ করলেন সেই পুরস্কার। কবি শঙ্খ ঘোষের হাত থেকে আশীর্বাদস্বরূপ এই পুরস্কার গ্রহণ করে কবি অভিভূত ও আবেগতাড়িত।

যে কবিতার বইটি নিয়ে এত আলোচনা, এত আনন্দ ঘিরে আছে, তার নাম হল 'নির্বাচিত কবিতা— মায়া এঞ্জেল্যু'। নির্বাচিত কবিতা ভাষান্তর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মায়া এঞ্জেল্যু— এই অসামান্য ব্যক্তিত্বর দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনের অসামান্য সৃষ্টি তাঁর পাঁচটি কাব্যসংকলন, যথাক্রমে— 1) Just Give Me a Cool Drink of Water fore I Diiie; 2) Oh Pray My Wings Are gonna Fit Me Well; 3) And Still I Rise; 4) Why Don't You sing?; 5) I shall Not Be Moved থেকে বেছে নিয়ে কিছু কবিতার অনুবাদে তাঁকে একবার ছুঁয়ে দেখার প্রচেষ্টা।

একমনে গল্প শুনতে শুনতে সময় যে কীভাবে বয়ে চলেছিল, বুঝতেই পারিনি। সেই ফাঁকে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করি, কতদিন ধরে এই প্রয়াস? মিষ্টি হাসিমুখে উনি জানান, 'কবিতাগুলোর ভাষান্তর করেও দু'বছর যাবৎ এক মলাটের মধ্যে নিয়ে আসার উদ্যোগ করে উঠতে পারিনি।' প্রতিবেশী বন্ধু-দেশ থেকে বই প্রকাশের উত্তেজনা ও আনন্দ যে সম্পূর্ণই অন্যরকম তা সে দিন কবির চোখে-মুখেই ধরা পড়েছিল। সংকলনটি প্রকাশের বিষয়ে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়েছেন কবি-বন্ধু রাহেল রাজীব। কথা প্রসঙ্গে সেই কবি-বন্ধুকেও কৃতজ্ঞতা জানাতে তিনি একবারও ভুল করেননি। সেই সঙ্গে দুই বাংলার পাঠকদেরও, যাঁরা সহায় না হলে এই উদ্যোগ সফল হয়ে উঠত না।

কবি প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ— হাওয়াদের গান গল্প, চৌকাঠে দাঁড়ানো মেঘ, আমি ও ব্যালেরিণা, শ্রাবণ জল আমাকে নাও, টাইটেল সং, ডাকনাম জলের নিবিড়ে, তেমন কিছু জরুরী নয়, আছি।

কবি অনিন্দিতা গুপ্ত রায়ের এই স্বপ্ন সফল হওয়ায় 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে তাঁকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। আমরা ওঁর আগামী সাফল্যের অপেক্ষায় পথ চেয়ে রইলাম। 'কলম চলুক কলমের পথে, ভাষান্তর আনুক আরও অনেক অসামান্য জীবনের'।

ডালিয়া রায়চৌধুরী

দর্পণ নাট্যগোষ্ঠীর নারী দিবস উদ্‌যাপন

গত ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস উদ্‌যাপন করল দর্পণ নাট্যগোষ্ঠী জলপাইগুড়ির বান্ধব নাট্যসমাজ-এর মিনি হলে। একই সঙ্গে তারা উদ্‌যাপন করল এই সংস্থার দশম জন্মদিনও। দশটি মোমবাতি জ্বালিয়ে 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' উদ্‌বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। এর পর বক্তব্য রাখেন এই সংস্থার সম্পাদিকা তন্দ্রা চক্রবর্তী। নারী দিবসের যথার্থতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন কৃষ্ণকলি মুখার্জি। অনুলিপি মৌলিকের নাচ ও নিবিড়া চক্রবর্তীর গান দর্শকের মন ছুঁয়ে যায়। সীমা সান্যাল, সঞ্চালী গাঙ্গুলি, রীনা ভারতী, মৌসুমী কুণ্ডুর কবিতা ছিল এ দিনের আকর্ষণ। নবনীতা দাসের নাচ দর্শকের হাততালি আদায় করে। দর্শকের আসনে উপস্থিত ছিলেন হীরক চক্রবর্তী, বরুণ ভট্টাচার্য, কল্যাণ চক্রবর্তী, বিমোহক চক্রবর্তী, ভজন বোস, প্রদীপ চক্রবর্তী, রামচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানের মাঝে কেক কেটে দর্পণের জন্মদিন উদ্‌যাপন করেন এই সংস্থার সদস্যরা। কবি শুভ দাশগুপ্তর 'অসতো মা' কবিতা-কোলাজের মধ্যে দিয়ে অভিনয় ছিল এই সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ। সুন্দর এই উপস্থাপনার মাধ্যমে সংস্থার সদস্যরা তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শেষ হয় সমবেত সংগীতের মধ্যে দিয়ে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বীথিকা বর্মণ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

শতাধিক বছরের ‘সমাজ’ আর্যনাট্য

গোড়ার কথা

১১৪ বছরে পা দিল জলপাইগুড়ির আর্য নাট্যসমাজ।

খাতায়-কলমে সমাজের প্রতিষ্ঠা ১৯০৪ হলেও তারও দু’বছর আগে শশীকুমার নিয়োগী তাঁর বাসভবনের আঙিনায় তৎকালীন জলপাইগুড়ি শহরের বুদ্ধিজীবীদের ডেকেছিলেন শহরে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য। দিনটা ছিল ১৩ ফেব্রুয়ারি। সে দিনের সভাতেই সর্বসম্মতিক্রমে গড়ে উঠেছিল আর্য নাট্যসমাজ। ঘটনাটি ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে শুরুতেই মঞ্চ জোটেনি সমাজের। প্রথম নাটকের অভিনয় হয়েছিল বৈকুণ্ঠপুরের রাজাভিভাবক জগদিন্দ্রদেব রায়কতের বাড়ির উঠোনে।

আর্য নাট্যের প্রতিষ্ঠা হিসেবে ১৯০৪ বছরটিকে গ্রহণ করার কারণ, সে বছর সমাজের নিজস্ব মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহ জুটেছিল। শহরে দানবীর বলে খ্যাত মহম্মদ সোনাউল্লা এবং বাবাজি বৈরাগী নামে আরও এক ব্যক্তির বিপুল পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে খাস করে নিয়েছিল ইংরেজ সরকার। শশীকুমারের নেতৃত্বে আইনজীবীরা জজ কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করে সেসব জমি ছাড়িয়ে আনেন। মামলা লড়ার জন্য তাঁরা কেউ পারিশ্রমিক নেননি। তাই সোনাউল্লা আর্য নাট্যকে দুটো পাটের গুদাম দান করেন এবং বাবাজি বৈরাগী দান করেন তিন বিঘা জমি। সেই জমিতে আর্য নাট্যের সদস্যরা পাটের

গুদাম থেকে টিন-কাঠ-তক্তা-খুঁটি এনে কিছু দিনের মধ্যে বানিয়ে ফেলেন সমাজের নিজস্ব মঞ্চ, সাজঘর এবং প্রেক্ষাগৃহ। সে মঞ্চে তাঁদের প্রথম নাটক ছিল ‘হরিশ্চন্দ্র’।

১৯০৯ সালে শশীকুমার নিয়োগীর মাত্র ৪১ বছর বয়সে মৃত্যু হলে বেশ কিছুদিন অস্তিত্বের সংকটে ভুগেছিল সমাজ। শেষে শহরের নাগরিকরা এগিয়ে এসে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে আবার চালু করেন সমাজের কাজকর্ম। নির্বাচনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। সেই থেকে এখনও আর্য নাট্যের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসছে একটি পরিচালন কমিটি।

কেবল নাটক নয়

স্বাধীনতা পর্যন্ত কেবল একটি শৌখিন নাট্যসমাজ হিসেবে কাজ করেনি আর্য নাট্য। তখন তার অন্যতম দায়িত্ব ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে পরোক্ষ সহযোগিতা করা। শহরের কোনও বাড়িতে উৎসব-অনুষ্ঠান হলে সদস্যরা দল বেঁধে হাজির হতেন গৃহকর্তাকে সাহায্য করার জন্য। অসুস্থ-আর্তের সেবার কাজেও তাঁরা এগিয়ে আসতেন। ১৯২০ সালে শহরে জেলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হলে তার প্রথম মিটিং হয়েছিল সমাজের মঞ্চে। অচিরেই দেখা গেল যে, রাজনৈতিক প্রচারে কাজে সে সময় যাঁরাই জলপাইগুড়িতে এসেছেন, প্রত্যেকের পছন্দ ছিল আর্য নাট্যসমাজ। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দলের প্রচারে এলেন সমাজের প্রাঙ্গণে। পরের বছর সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সরোজিনী নাইডু, ১৯২৮-এ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ১৯২৮-এ সুভাষচন্দ্র বসু— এঁরা সবাই তাঁদের সভার জন্য আর্য নাট্যকে বেছে নিয়েছিলেন। এর কারণ এই নয় যে শহরে আর সভা করার জায়গা ছিল না। স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি আর্য নাট্যের প্রচ্ছন্ন সমর্থন তাঁদের জানা ছিল বলেই উক্ত সমাজকে বেছে নিতেন।

সংস্কৃতি, সমাজসেবা এবং রাজনীতিতে পরোক্ষ সমর্থন জোগানোর পাশাপাশি

২০০৩ সালে শতবর্ষ উৎসবে আর্যনাট্য সমাজের সদস্যগণ, ছবি: শংকর ভট্টাচার্য

শরীরচর্চারও আয়োজন ছিল সমাজে। বাইরের প্রাঙ্গণে ছিল টেনিস কোর্ট। ১৯৬৮-এর ভয়াবহ বন্যায় সে কোর্ট চলে গিয়েছে মাটির নিচে। সেই বন্যা আরও এক মূল্যবান সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছিল— সমাজের লাইব্রেরি।

সমাজের শতবর্ষ উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০০৩-এর 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ প্রয়াত কামাখ্যাপ্রসাদ চক্রবর্তী একটি রচনায় উল্লেখ করেছিলেন ১৯২৯-৩০ সালে আর্য নাট্যের দার্জিলিং সফরের কাহিনি। সেখানে প্রথম রজনির অভিনয় দেখতে হাজির ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী অবলা বসু। ছিলেন কোচবিহারের মহারানি ইন্দিরা দেবী, বাংলার রাজ্যপাল স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন, বর্ধমানের মহারাজ, নসিপুর এবং সিকিমের মহারাজ। বস্তুত, সে সময়ে কলকাতার পেশাদার নাট্যদলগুলির সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিত আর্য নাট্যের অভিনয়।

রবীন্দ্রভবন

জলপাইগুড়ি শহরে আলাদা কোনও রবীন্দ্রভবন নেই। আর্য নাট্যের মঞ্চটিই রবীন্দ্রভবনের স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৫৯ সালে সমাজের তৎকালীন সভাপতি সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী হুমায়ুন কবীরকে এনে আর্য নাট্য পরিদর্শন করানোর। হুমায়ুন কবীর জলপাইগুড়িতে আসেন, এবং সমাজের গৃহ পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হয়ে 'মাচিং গ্রান্ট স্কিম'-এর অধীন অর্থ বরাদ্দ করিয়ে গৃহটিকে রবীন্দ্রভবনে উন্নীত করিয়েছিলেন।

১৯৬৮ সালের ভয়াবহ বন্যা করলাপাড়ে অবস্থিত আর্য নাট্যসমাজের পাকা ভবনটির বিশেষ ক্ষতি করতে না পারলেও ঐতিহাসিক নথি, ছবি, স্মৃতি চিরকালের জন্য ধ্বংস করে দিয়েছিল। পাশাপাশি আরও কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন, করলার জল বাড়লে তা মাটির নীচ দিয়ে সমাজের প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করছিল। মঞ্চের কাঠের পাটাতনের নিচে যে গহ্বর, সেখানে জল জমে যাওয়ার কারণে মূলমঞ্চের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল। পাশাপাশি জরুরি হয়ে উঠছিল একতলা এবং দোতলার ব্যালকনির শৌচাগারগুলির সংস্কার করা। কিন্তু আর্য নাট্যসমাজ লাভজনক সংস্থা নয়। প্রায় নয়শো আসনবিশিষ্ট এই প্রেক্ষাগৃহের ভাড়া পেশাদার অনুষ্ঠানের জন্য মাত্র তিন হাজার টাকা। অপেশাদার দলগুলির জন্য আরও কম। ফলে আয়ের টাকা থেকে খরচ বাঁচিয়ে সংস্কার এবং মেরামতি করা অসম্ভব ছিল তাদের পক্ষে।

সুখের কথা, শতাব্দীপ্রাচীন আর্য নাট্যের সংস্কারের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার এগিয়ে এসেছে। দু'দফায় বরাদ্দ হয়েছে দেড় কোটি টাকার বেশি। সংস্কারের কাজ প্রায় নব্বই শতাংশ সম্পূর্ণ। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী পঁচিশে বৈশাখের মধ্যে সংস্কারের কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা আর্য নাট্য তথা রবীন্দ্রভবন আবার উন্মুক্ত হবে নাট্যামোদীদের কাছে।

আমাদের প্রতিনিধিকে এ কথা জানিয়েছেন সমাজের বর্তমান সেক্রেটারি সমর সিং।

সন্তু চ্যাটার্জির সংযোজন

আমি আর্য নাট্যের সঙ্গে যুক্ত হই ১৯৬০ সালে। তখন আমার বয়স পঁচিশ। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি সমাজের কর্মকাণ্ড। আমি যখন যুক্ত হই, সেটা আর্য নাট্যের স্বর্ণযুগ। থিয়েটার শুরু হত রাত ন'টা-সাড়ে ন'টা নাগাদ। চলত ভোর পর্যন্ত। দর্শকদের উন্মাদনার কথা এখন বললে বিশ্বাস করবে না।

আর্যনাট্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শশীকুমার নিয়োগী

আর্য নাট্যের মঞ্চ ও প্রাঙ্গণ বহু খ্যাতনামা গুণী ব্যক্তির পদার্পণে পুণ্য। পুরনো দিনের কথা ছেড়ে দাও। ১৯৬০-এ আমি যুক্ত হওয়ার পর দেখেছি সমাজ পরিচালিত 'কলা প্রতিযোগিতা'র উন্মাদনা। সেই প্রতিযোগিতা ছিল সেকালের সা-রে-গা-মা-র মতো আত্মপ্রকাশের মঞ্চ। যাঁরা পুরস্কার পেতেন, তাঁরা সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তির ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রতিভা হিসেবে বিবেচিত হতেন বাংলায়। তিন দিনের প্রতিযোগিতা শেষ হত উচ্চাঙ্গসংগীতের রাতব্যাপী আসরের মধ্যে দিয়ে। সে আসরে কে আসেননি বলো? ভীমসেন জোশি, তারাপদ চক্রবর্তী, আমজাদ আলি খান, এ টি কানন, মালবিকা কানন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল ব্যানার্জি, বাহাদুর খাঁ— এমন অনেক রথী-মহারথী। ভাবতে ভাল লাগে যে, এদের আনার পিছনে আমার উদ্যোগ ছিল। আর্য নাট্যের হয়ে হেমন্ত-মান্নাকেও এনেছি আমি।

এখানে জানিয়ে রাখি যে, নাটকের

৬০-এর দশকে গ্রিন রুমে সাহিত্য আড্ডা

সেকালে বাংলা চলচ্চিত্রজগতের ডাকসাইটে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেকেই আমাদের ডাকে সমাজের মঞ্চে নাটক করে গিয়েছেন। আর সমাজের বাইরে যাঁরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন এই মঞ্চে, তাঁদের ডাকেও এসেছেন আরও আরও বিখ্যাত শিল্পী। যেমন— রবিশংকর, জাকির হুসেন, শিবকুমার শর্মা, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া থেকে একালের রশিদ খান। নাটকের ক্ষেত্রে হাবিব তনবির থেকে শুরু করে মনোজ মিত্র।

পাশাপাশি উচ্চাঙ্গসংগীতচর্চার ক্ষেত্রেও সমাজের বিরাট ভূমিকা ছিল। সেকালে বাংলা চলচ্চিত্রজগতের ডাকসাইটে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেকেই আমাদের ডাকে সমাজের মঞ্চে নাটক করে গিয়েছেন। আর সমাজের বাইরে যাঁরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন এই মঞ্চে, তাঁদের ডাকেও এসেছেন আরও আরও বিখ্যাত শিল্পী। যেমন— রবিশংকর, জাকির হুসেন, শিবকুমার শর্মা, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া থেকে একালের রশিদ খান। নাটকের ক্ষেত্রে হাবিব তনবির থেকে শুরু করে মনোজ মিত্র। আমরা মনোজবাবুর অনেক নাটকের অভিনয় করেছি সমাজের পক্ষ থেকে।

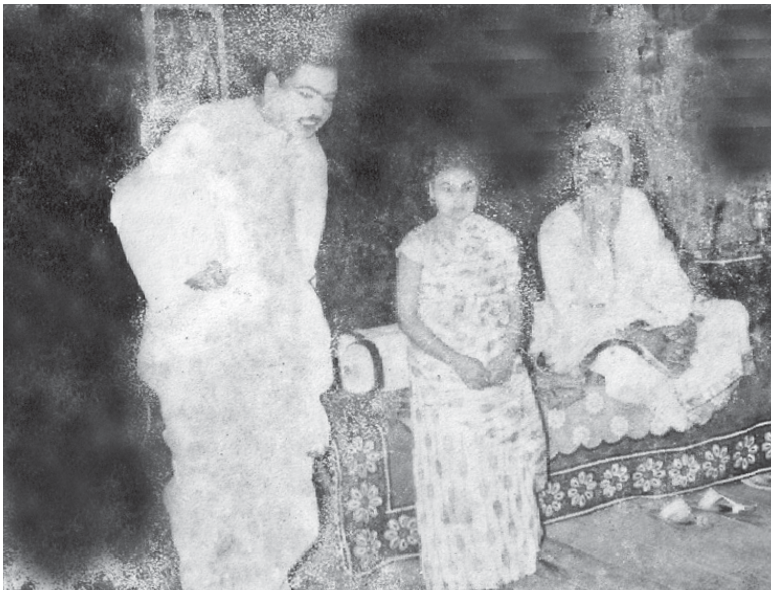

'আমি মন্ত্রী হব' নাটকের একটি দৃশ্য (১৯৭২)

> জলপাইগুড়ি শহর তৈরী হওয়ার পর সুস্থ বিনোদনের অভাব ছিল। শিক্ষিত ছেলেরা বিপথে যাচ্ছিল। তখন শশীকুমার নিয়োগী আর্যনাট্যের কথা ভেবেছিলেন। নাটকের মাধ্যমে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। এটা মনে রাখা দরকার। আর্যনাট্য সে কারণে প্রতি বছর পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

আমি কিন্তু মনে করি, সংগীত ইত্যাদি থাকলেও সমাজের মূল লক্ষ্য হল ভাল নাটক করা। জলপাইগুড়ি শহর তৈরি হওয়ার পর সুস্থ বিনোদনের অভাব ছিল। শিক্ষিত ছেলেরা বিপথে যাচ্ছিল। তখন শশীকুমার নিয়োগী আর্য নাট্যের কথা ভেবেছিলেন। নাটকের মাধ্যমে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। এটা মনে রাখা দরকার। আর্য নাট্য সে কারণে প্রতি বছর পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

এবার আর্য নাট্যের যে সংস্কার চলছে, সে বিষয়ে কিছু বলি। অনেক অসুবিধের মধ্যে নাটক বা অনুষ্ঠান করতে হত এখানে। তারপর সরকার এগিয়ে এল। ওরা প্রথমে ঠিক করেছিল, প্রতিটি রবীন্দ্রভবনকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করবে। কিন্তু দেখা গেল যে, এতে কেউই বেশি টাকা পাচ্ছে না। যা পাচ্ছে তা দিয়ে বিশেষ কিছু করা সম্ভবও হবে না। তখন সরকারের প্রতিনিধিরা ঠিক করলেন যে, কোনও একটা প্রতিষ্ঠানকে ভাল করে সাহায্য করবেন। প্রথমেই তাঁরা নির্বাচন করলেন একশো বছর পেরিয়ে যাওয়া আর্য নাট্যকে। ফলে আমরা উপকৃত হলাম। এখন মঞ্চে যে কাঠের প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে, তার কাঠ আনা হয়েছে বাইরে থেকে। দু'পাশে তৈরি হয়েছে থ্রি-স্টার সুবিধাযুক্ত সাজঘর। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা সাজঘর। সেখানে আধুনিক টয়লেট থাকছে। মূল গ্রিনরুমে পনেরোটা ফ্যান ছাড়াও উচ্চমানের আয়না আর আলো বসানো হচ্ছে। এসি-র ব্যবস্থা থাকছে। কাজ হয়ে গেলে দেখবে যে, এর মতো অডিটোরিয়াম রাজ্যে খুব কমই আছে। সীমানা প্রাচীর অবশ্য এসজেডিএ বানিয়ে দিচ্ছে আমাদের।

অবশ্য একটা ক্ষতিও হয়েছে। দর্শকাসনে গদিওয়ালা চেয়ার বসাতে গিয়ে আসনসংখ্যা দু'শোর মতো কমে গিয়েছে। এতে আমার একটু আপত্তি ছিল, কিন্তু উপায় নেই। আরও টুকটাক কিছু মেরামতির দরকার হবে হল চালু হওয়ার পর। উনিশে এপ্রিল আমরা পিডব্লিউডি-র সঙ্গে বসছি। ইলেকট্রিফিকেশনের কাজটাই বাকি আছে। খুব আশা করছি যে, এই পঁচিশে বৈশাখের আগেই কাজ শেষ হয়ে যাবে, এবং আর্য নাট্য আবার চালু হবে। শব্দপ্রক্ষেপণের যে ত্রুটি ছিল, সেটা চমৎকারভাবে মিটে গিয়েছে। সংস্কারের পর বর্তমান মূল গ্রিনরুমটিও ছোটখাটো অনুষ্ঠানের উপযোগী হয়ে উঠবে। আমরা জানি যে, শহরের নাট্যদলগুলি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নতুন মঞ্চে নাটক করার জন্য। আর্ট কমপ্লেক্স বলে যেটা তৈরি হয়েছে, সেখানে তো আর নাটক করা যায় না!

সমাজের প্রবীণ সদস্যদের অধিকাংশ আমাদের ছেড়ে চিরকালের মতো চলে গিয়েছেন। এখন নতুন সদস্যদের দায়িত্ব, আর্য নাট্যকে তার গৌরবের আসনে ফিরিয়ে আনা। একদা সদস্যরা সমাজের কাজকে সংসারের দৈনন্দিন কাজের চাইতেও বেশি গুরুত্ব দিতেন। আমি খুব আশাবাদী যে, সেটা আবার ফিরে আসবে।

শেষ কথা

জলপাইগুড়ির নাটকের দলগুলি সতিই অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ। রূপায়ণ-এর পরিচালক দীপঙ্কর রায়, সৃষ্টি মাইম-এর সব্যসাচী দত্ত, কলাকুশলীর তমোজিৎ রায়, শিলালী নাট্যম-এর অশোক ভট্টাচার্য-সহ ডজনখানেক নাট্যদলের পরিচালকরা নবগঠিত আর্য নাট্যের মঞ্চে নাটক করার জন্য দিন গুনছেন। সমাজের সদস্যরাও দু'টি নাটক তৈরির অপেক্ষায় আছেন। শতাব্দী এক্সপ্রেসের সওয়ার হয়ে আর্য নাট্য বহু বহু স্টেশন পেরিয়ে যাবে— এটা নিশ্চিত।

শুধু দেখার যে কোন স্টেশনে কে ওঠে আর কে নেমে যায়।

টুকিটাকি

১) স্বাধীনতার পরেও আর্য নাট্যে মহিলাদের অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল। ছেলেরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। বাইরে থেকে নাটক করতে আসা দলগুলির সঙ্গে কোনও প্রতিভাবান 'সখী' অভিনেতা থাকলে আর্য নাট্যের লোকজন তাঁকে ছলে-বলে-কৌশলে 'তুলে' নিতেন। এর জন্য সমাজে বিশেষ একটা 'টিম' ছিল।

২) অভিনয় শেখানোর জন্য সতীশ মাস্টার বলে একজন মোশন মাস্টারকে কলকাতা থেকে আনা হয়েছিল গোড়ার দিকে। তিনি নাটকের দৃশ্যপট আঁকার কাজও শিখিয়েছিলেন সদস্যদের।

৩) একসময় সমাজের সদস্যরা শারদীয় দুর্গা পূজা করতেন সমাজের মাঠে।

৪) প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে শহরের প্রতিটি বাড়ির কেউ না কেউ আর্য নাট্যের সদস্য ছিলেন।

৫) আর্য নাট্য পরিচালিত একটি সংগীতশিক্ষাকেন্দ্র ছিল। নাম ছিল 'ছন্দম'।

৬) প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে, তিনের দশকে আর্য নাট্যের প্রাঙ্গণে টেনিস টুর্নামেন্ট হত। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খেলোয়াড়রা আসতেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ছবি: রবীন্দ্র ভবনের সৌজন্যে

লাল চন্দন নীল ছবি

অরণ্য মিত্র

বুদ্ধ ব্যানার্জি তাঁর সাধের ব্ল্যাক বেঙ্গল টিমে নবীন রাইকে রাখেননি। ক্যাভেন্ডিস কাঠমান্ডু এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। পুলিশের খাতায় মৃত কেএলও জঙ্গি পল অধিকারীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হল দাসবাবুর। তাঁর কাছে লাল চন্দন বিষয়ক প্রস্তাব শুনে উৎসাহিত বোধ করলেন পল অধিকারী। কন্যাসাথি ফাঁদে পা দেওয়া রূপালি মুন্ডা ঘটনাচক্রে এখন তান্ত্রিক ভবানী দেবীর হাতে। দেহব্যবসায় নামা ছাড়া আর কী বিকল্প আছে রূপালির? সে সহজেই রাজি হয়ে গেল কেন? রূপালিও কি হারিয়ে যাবে তবে কালো স্রোতে?

৮৮

চামুর্চি ছাড়িয়ে উত্তরে খানিকটা যাওয়ার পর অজয় বর্মনের বড় উঠোনওয়ালা বাড়ি। এখানেই থাকবে পল অধিকারী। বাস স্ট্যান্ড থেকে তাঁর লোক পথ দেখিয়ে দাসবাবুকে সে বাড়ির সামনে নিয়ে এসে বিদায় নিল। উঠোনে দুটো ছোট ট্রাক দাঁড়িয়ে। এলাকার ছোট চা-বাগানগুলো থেকে কাঁচা পাতা কিনে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে সাপ্লাই দেওয়াটা অজয় বর্মনের পেশা। সবাই জানে, শিলিগুড়ির কোনও এক ফ্যাক্টরি মালিকের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে অজয় বর্মনের। তাই তিনি লোকাল ফ্যাক্টরিতে পাতা পাঠান না।

বিকেল গড়িয়ে এসেছে। দাসবাবু ট্রাক দুটোর পাশ দিয়ে একটু এগতেই ভিতর থেকে অজয় বর্মন বেরিয়ে এলেন। ভিতরে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা উঠোনে শতরঞ্চি পেতে একটা লোক ধ্যানস্থ ভঙ্গিতে বসে ছিল। এর বাইরে আর কেউ বাড়িতে নেই। এখানে যে দু'জনের বেশি থাকবে না, সেটা অবশ্য আগেই বলা হয়েছিল দাসবাবুকে।

'কাউকে খুঁজছেন?' দাসবাবুকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করলেন অজয় বর্মন।

'চিংড়িয়া যাম।' শান্ত গলায় কোডটা উচ্চারণ করলেন দাসবাবু। অজয় বর্মনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। লোকটার বয়স পঞ্চাশের আশপাশে হওয়া উচিত। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। পোশাক-পরিচ্ছেদ অতি সাধারণ। দাসবাবুকে ভিতরে যাওয়ার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'ও অপেক্ষা করছে।'

শতরঞ্চিতে বসে থাকা লোকটা এবার মাথা তুলে দাসবাবুকে আসতে দেখলেন। তাঁর মুখে কোনও উত্তেজনা নেই। জানা না থাকলে দাসবাবু একবারের জন্যও লোকটাকে পল অধিকারী বলে সন্দেহ করতে পারতেন না। তিনি জুতো খুলে একটু কষ্ট করেই বসলেন পল অধিকারীর মুখোমুখি। সেটা লক্ষ করে পল অধিকারী মৃদু হেসে বললেন, 'ফিটনেস কমে গিয়েছে দাদা?'

'কোমরে একটা টানের মতো লেগেছে।' দাসবাবুও হাসলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে বললেন, 'অবশেষে আপনার সঙ্গে দেখা হল। মেমোরেবল ডে!'

'আপনার খবর আমি পেয়েছি।' করমর্দনের পালা সাঙ্গ করে পল অধিকারী নড়েচড়ে বসলেন— 'অজয় আমার খাস লোক। চা-পাতার নিচে লাল চন্দনের টুকরো বাক্সে ভরে পাঠায়। এখন ছোট ছোট রুটে কাঠ পাঠানো হয় ধাপে ধাপে। এতে একটু সময় লাগলেও ঝুঁকি অনেক কমে যায়। অজয়ের মতো এমন তিরিশ-বত্রিশজন আছে ডুয়ার্সে। সুরেশ কুমার যদি এদের সাপোর্ট দেয়, তবে প্রফিট থার্টি-সেভেন্টি হতে পারে।'

'থার্টি?' দাসবাবু একটু হাসলেন, 'আমাদের ভাগটা আরেকটু বাড়ানো যাবে না বলছেন? ধরুন, ওই তিরিশজনের কাছ থেকে সুরেশ কুমার মাল কালেক্ট করে যদি নেপালে পাঠিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়, তবে আমরা কত পেতে পারি?'

'মাল আপনার নিজের রিস্কে ইন্ডিয়ার বাইরে পাঠাবেন?' পল অধিকারী বিস্মিত গলায় বললেন,

'একবারে তিন-চার কুইন্টাল কাঠ নেপাল বর্ডার পার করিয়ে দেওয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আপনাদের?'

'না, তা নেই। সুরেশ কুমার আপনাদের মাল ডুয়ার্স থেকে কিনে নিয়ে স্টক করবে।' বোঝাতে লাগলেন দাসবাবু, 'আমরা ক্যাশে কিনব। স্টক করে রাখলে কাঠের ক্রাইসিস হতে বাধ্য। তখন দাম বাড়বে। দাম বাড়লেই আপনার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মাল আমরা নেপালে পাঠিয়ে দেব। এর জন্য অবশ্যই আপনি আলাদা খরচ দাবি করতে পারেন।'

'তাহলে আর পার্সেন্টেজের দরকার কী?' পল অধিকারীর গলায় উৎসাহ ধরা পড়ল।

দাসবাবু মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'এগজ্যাক্টলি! নেপালে মাল পাঠানোর চাপ সারা বছর একরকম থাকে না। অপেক্ষা করে সুযোগ বুঝে বর্ডার পার করাতে পারলে ঝুঁকি প্রায় থাকে না বললেই চলে। কিন্তু কাঠ যারা আপনাদের পাঠায়, তাদের টাকা মেটানোর তাড়া থাকে বলে আপনারা মাল ফেলে রাখতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে টাকা আমরা মিটিয়ে দেব। আপনি স্টক করবেন।'

'খুব ভাল প্রস্তাব দাদা!' পল অধিকারীকে উৎফুল্ল দেখায়, 'এসব নিশ্চয়ই বুদ্ধ ব্যানার্জির প্ল্যান? আমি রাজি। ওঁকে বলবেন, আমার লোক ডুয়ার্সের যে কোনও এলাকায় বোমা ফাটানোর জন্য রেডি হয়ে আছে। সাত দিন আগে বলে দিলেই ফাটিয়ে দেবে।'

'সাত দিন কেন?' দাসবাবু এবার উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত কোমরে রেখে টানটান হলেন— 'ডেট এখনই বলে দিচ্ছি। পঁচিশে বৈশাখ। ঠিক সন্ধে ছ'টায় ব্ল্যাক বেঙ্গলের উদ্বোধন। ঘড়ির কাঁটা ধরে সেই দিন বোমা ফাটাতে হবে।'

'প্লেস?'

'আপনার সিদ্ধান্ত। তবে বিস্ফোরণ হবে প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করার জন্য। দেখে মনে হবে, অল্পের জন্য অনেক লোকের প্রাণ বেঁচে গেল। ডুয়ার্সের কোনও একটা হাটে গভীর রাতে বোমা ফাটালে ভাল হয়।'

'হয়ে যাবে। এটার নাম দিলাম— অপারেশন রবীন্দ্রনাথ।'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জানালেন দুর্দান্ত কেএলও জঙ্গি নেতা পল অধিকারী।

৮৯

কেউ বলে 'দিল্লি হাই', কেউ বলে 'দিল্লি এক্স'। আসলে দলটার নাম 'দিল্লি হাই অ্যান্ড এক্স সার্ভিস'। সে দলের হয়ে নীল ছবি তৈরি করলেও দল সম্পর্কে খুব একটা ধারণা ছিল না নবীন রাইয়ের। দু'-দু'বার বন্দুকের ধমক খাওয়ার পর সে ভেবেছিল, শিলিগুড়িতে আর ফিরবেই না। নেপাল থেকেই যা করার করবে। 'ডার্ক ক্যালকাটা' নামক প্রতিদ্বন্দ্বীর খবর পাওয়ার আশায় পয়সা খরচা করে রতন বিশ্বকর্মাকে অনুসন্ধানের কাজে লাগিয়ে বিশেষ ফল পাওয়া যায়নি। উলটে জলপাইগুড়ি থেকে টাকা নিয়ে শিলিগুড়ি ফেরার পথে গুলি খেয়ে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে। এখন সে লুকিয়ে আছে দার্জিলিঙে। নেপাল থেকে সেক্স ডলের ব্যবসা অবশ্য মন্দ চলছে না। কিন্তু দিল্লি হাই-এর মতো একটা দলের সাহায্য ছাড়া ইন্ডিয়ার মাটিতে ঠিকঠাক ধান্দা চালানো অসম্ভব। নবীন রাইয়ের মনে হচ্ছিল যে, দিল্লি হাই ডুয়ার্সে দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ডার্ক ক্যালকাটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খাচ্ছে তারা।

কিন্তু নবীন রাইয়ের যাবতীয় টেনশন দূর করে দিয়েছেন ক্যাভেন্ডিস।

সে দিন সকাল দশটা নাগাদ নিজের বাড়ির লনে বসে চিন থেকে আসা সেক্স ডলের লেটেস্ট মডেলগুলোর ভিডিয়ো দেখছিলেন নবীন রাই। ভারতীয় পুরুষদের কথা মাথায় রেখে পুতুলগুলো সদ্য রিলিজ করা হয়েছে। এদের মুখ দিয়ে হিন্দি ভাষায় কামোত্তেজক ধ্বনি নির্গত হয়। শরীরের গঠন লিকলিকে নয়, বরং কিঞ্চিৎ গোলগাল। নীল ছবি বানাতে গিয়ে নবীন রাইও টের পেয়েছেন যে, ভারতীয় পুরুষ জিরো ফিগারের চেহারা বিশেষ পছন্দ করে না। চিনা কোম্পানি এই পুতুলগুলো তৈরির আগে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিল। পুতুলের ভিডিয়ো দেখতে দেখতে তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, কোম্পানি তাঁর পরামর্শ উপেক্ষা করেনি।

ক্যাভেন্ডিস এসেছিলেন সেই সময়ে। দিল্লি থেকে কেউ একজন দেখা করতে এসেছে শুনে অবাক হয়েছিলেন নবীন রাই। তবে সে লোক যে দিল্লি হাই-এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি, সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি তিনি। কারণ বুদ্ধ ব্যানার্জি ছাড়া সে দলের আর কোনও শক্তিশালী নেতার কথা জানতেন না তিনি। গেটে মোতায়েন নিরাপত্তারক্ষীদের তল্লাশিতে পাশ করার পর আকাশি কোট পরা লোকটি যখন নবীন রাইয়ের মুখোমুখি বেতের চেয়ারে বসে ইংরিজিতে নিজের পরিচয় দিলেন, তখন বোঝা গেল তিনি কে।

'কিন্তু নেপালে আমার খোঁজ আপনি পেলেন কীভাবে?' বেশ আগ্রহ নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন নবীন।

'দিল্লি হাই-এর ডেটাবেস ঘেঁটে মনে হল, আপনি নেপালেই থাকবেন।' জবাব দিয়েছিলেন ক্যাভেন্ডিস, 'একমাত্র আপনার উপরেই দু'-দু'বার আক্রমণ হয়েছিল। কিন্তু আপনাকে মারতে চায়নি বলেই বেঁচে গিয়েছেন।'

'এমন আক্রমণের কারণ কী হতে পারে?' নবীন রাই বিস্ময় চেপে রাখলেন না, 'আমাকে ভয় দেখানোর কারণ কী?'

'এতে প্রমাণ হয়েছে যে, ডার্ক ক্যালকাটা ইচ্ছে করলে আমাদের লোককে চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে। এটা ওদের ইমেজ বাড়াতে সাহায্য করেছে। তবে আপনি সত্যিই অবাক হবেন যখন জানবেন যে, ডার্ক ক্যালকাটা বলে কিছু ছিল না।'

'মানে?'

'ওটা বিশেষ একজনের প্ল্যান। কার প্ল্যান অনুমান করতে পারেন?' প্রশ্নটা শুনে নবীন রাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্যাভেন্ডিসের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুদ্ধ ব্যানার্জি?'

'চমৎকার অনুমান মিস্টার রাই।'

'আমি জানতাম!' ঊরুতে চাপড় মেরে ক্ষোভের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করলেন নবীন রাই, 'যেভাবে আমার অবস্থান ওরা জেনে যাচ্ছিল, তার ব্যাখ্যা একটাই। সাবোটাজ! ব্যানার্জি দলের মধ্যে থেকে ফাউল করেছেন। কিন্তু কেন? তিনি কি ডার্ক ক্যালকাটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন?'

'না। ডার্ক ক্যালকাটা আসলে তাঁরই সৃষ্টি।'

'আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মিস্টার ক্যাভেন্ডিস।'

'আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। বুদ্ধ ব্যানার্জি ডুয়ার্স থেকে পুরো নর্থ-ইস্ট পর্যন্ত নিজের মতো করে চালাতে চান। এর জন্য তিনি ব্ল্যাক বেঙ্গল নাম দিয়ে একটা দল বানিয়েছেন। ডার্ক ক্যালকাটাকে সে দলে মিশিয়ে দিয়েছেন তিনি। আমাদের দল থেকে যারা ডুয়ার্সে মূল দায়িত্বে ছিল, তারা সবাই প্রায় যোগ দিয়েছে ব্ল্যাক বেঙ্গলে। কন্যাসাথি নামে একটা এনজিও-র আড়ালে মেয়ে পাচারের কারবার তিনি খুলেছিলেন কাশিয়াগুড়ি নামে একটা গ্রামে। সেটা ডুয়ার্সে ধূপগুড়ি আর ফালাকাটার মাঝখানে। কিন্তু দলকে সে ব্যাপারে কোনও ইনফর্মেশন দেননি। অথচ আমাদের দলের লোকদের দিয়েই সেটা চালানো হচ্ছিল।'

'বুঝতে পারছি।' নবীন রাই উত্তেজিত হলেন, 'সুখান লাকড়া আর চঞ্চল থাপা বলে দু'জনকে নিয়ে ডুয়ার্সে মেয়ে পাচারের কাজটা আসলে সামলাত বিজু প্রসাদ। তিনজনকেই খতম করা হয়েছে। মানে ব্যানার্জিই লোক দিয়ে খতম করিয়েছিলেন ওদের!'

'একদম ঠিক ধরেছেন!' প্রশংসার সুরে বললেন ক্যাভেন্ডিস, 'আমার ধারণা, বুদ্ধ ব্যানার্জি আরও কিছুদিন আমাদের সঙ্গে খেলার পর নিজের দলকে ময়দানে নামাতেন। কিন্তু কন্যাসাথির কাজে একটা ছোট্ট ভুল হয়ে যায়। কাশিয়াগুড়ির এক

ছোকরা কোনও কারণে কিছু একটা টের পেয়ে গিয়েছিল। তাকে সরিয়ে ফেলতে অবশ্য দেরি হয়নি— কিন্তু জগন্নাথ বলে যে ছেলেটা সরিয়ে ফেলার কাজে যুক্ত ছিল, তার মোবাইল নাম্বার লিক হয়ে যায়। ফলে কন্যাসাথি তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না ব্যানার্জির।'

কথাগুলো টানা বলার পর একটু দম নিলেন ক্যাভেন্ডিস। তারপর একটু হেসে বললেন, 'দলের সর্বোচ্চ কমিটি বুদ্ধ ব্যানার্জির সঙ্গে এখনই লড়াইতে যেতে চায় না। তাই ভাবছি কিছুদিন মারিজুয়ানা নিয়ে লেগে থাকি। এ ব্যাপারে আপনি কী করতে পারেন?'

নবীন রাই জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি একটা মেয়ের খোঁজ করুন মিস্টার ক্যাভেন্ডিস। তার নাম মুনমুন টোপ্পো। বিজু প্রসাদকে সে গডফাদার ভাবত। ওকে আমাদের চাই।'

ক্যাভেন্ডিস অদ্ভুত হাসলেন।

৯০

ভবানী দেবীর মন আজ সকাল থেকেই প্রসন্ন। রূপালি মুন্ডা নামে যে মেয়েটাকে প্রেমের ফাঁদে ফাঁসিয়ে, ওষুধ মেশানো কোল্ড ড্রিঙ্কস খাইয়ে কন্যাসাথির লোকেরা তুলে এনেছিল— তাকে শেষ পর্যন্ত বাইরে পাঠানো যায়নি। কাশিয়াগুড়ি থেকে আপিস গুটিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণে রূপালিকে তারা তাদের 'ট্রেনিং সেন্টার'-এ পাঠাতে পারেনি। ভবানী দেবীর ট্রেনিং সেন্টারে সে এসেছে সিরাজুলের মাধ্যমে। অবশ্য কন্যাসাথি বা রূপালি নিয়ে আদৌ কোনও মাথাব্যথা ছিল না ভবানী দেবীর। তবে ক'দিন ধরে কাগজে কন্যাসাথি নিয়ে জোর খবর বেরুচ্ছে। চা-বাগান এলাকায় শিডিউলড ট্রাইব মেয়েদের নিয়ে কাজ করার অছিলায় তারা মেয়ে তুলে পাচার করত। পুলিশের অনুমান, কম করে চল্লিশজন মেয়ে পাচার করেছে তারা। জলপাইগুড়িতে এসসি হস্টেলে বিনে পয়সায় থাকা, ট্রেনিং আর চাকরির টোপ দিয়েই ধরা হত মেয়েদের। কাগজে রূপালি মুন্ডার নামও ছাপা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের এক স্কুল টিচার অভিযোগ করেছেন পুলিশের কাছে। রূপালি নিখোঁজ হওয়ার দু'দিনের মাথায় কন্যাসাথির লোকজন রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়।

ভবানী দেবীর মন প্রসন্ন হওয়ার কারণ আর কিছু নয়। রূপালি নামের মেয়েটা কাজে নামতে রাজি হয়েছে। তাকে আশ্রমের পিছনে একটা আলাদা ঘরে রাখা হয়েছিল। ভাবার জন্য দু'দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। এই দু'দিন অবশ্য কোনও অত্যাচার হয়নি রূপালির উপর। ভাবার সময় দিয়ে অত্যাচার করা ভবানী দেবীর না-পসন্দ। মেয়েটা আজ রাজি না হলে ভবানী দেবী তাঁর অন্যতম শিষ্য ভূষণকে ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। সে অনেক কায়দাকানুন জানে। যত মেয়ে আসে, তার বেশির ভাগই ভূষণের হাতে পড়ার পর রাজি হয়ে যায় কাজে নামতে। কেউ কেউ এর পরেও প্রতিবাদ জানায়। তখন ভূষণ তাকে ধর্ষণ করে। দু'-চারবার ধর্ষিতা হওয়ার পরেও কোনও মেয়ে যদি রাজি না হয়, তবে তাকে খুন করা ছাড়া আর কী উপায় থাকে?

রূপালি রাজি হওয়ায় ভবানী দেবী প্রফুল্ল মনে ধনেশ শিকদারের কথা ভাবছিলেন। মেয়েটা এখনও টাটকা। পুরুষের সঙ্গে শোয়নি। তদুপরি ভূষণের হাতে যাওয়ার আগেই কাজে নামতে রাজি হয়েছে। টাটকা জিনিস খুব পছন্দ ধনেশবাবুর। হাজার দশেক চোখ বুজে দিয়ে দেবেন এক রাতের জন্য। মেয়েটার থাকবে অর্ধেক।

যত মেয়ে আসে, তার বেশির ভাগই ভূষণের হাতে পড়ার পর রাজি হয়ে যায় কাজে নামতে। কেউ কেউ এর পরেও প্রতিবাদ জানায়। তখন ভূষণ তাকে ধর্ষণ করে। দু'-চারবার ধর্ষিতা হওয়ার পরেও কোনও মেয়ে যদি রাজি না হয়, তবে তাকে খুন করা ছাড়া আর কী উপায় থাকে?

অতি গরিব ঘরের মেয়ে ভবানী দেবী বারো বছর বয়সে প্রথম ধর্ষিতা হন পাড়ার দাদার সৌজন্যে। কিন্তু বাড়ির লোক ভবানী দেবীকেই দোষী ধরে নিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তিনি চেয়েছিলেন রেলে গলা দিয়ে মরতে। কিন্তু দেহব্যবসার এক দালাল তাঁকে রেললাইন থেকে নিয়ে আসে মুম্বইয়ের এক কোঠায়। সেই থেকে আমূল বদলে গিয়েছিলেন তিনি। শেষে এক হিন্দুস্থানি জ্যোতিষীর রক্ষিতা হয়ে ছিলেন কয়েক বছর। তাঁর কাছেই ভাগ্যগণনা আর তন্ত্রের নিয়মকানুন শিখেছিলেন। জ্যোতিষী মারা গেলে তিনি চলে আসেন জলপাইগুড়ি শহরের কাছাকাছি এই গ্রামে।

এমনিতে ভবানী দেবীর মনে কোনও দুর্বলতা নেই। কিন্তু তাঁর কাছে আসা যে মেয়ে দেহব্যবসায় নেমে পড়তে রাজি হয়ে যায়, তাঁদের প্রতি তিনি কোথাও একটা টান অনুভব করেন। শরীর বিক্রি করে মেয়েদের যা প্রাপ্য, তাতে কোনও দিনও ভাগ বসান না। রূপালিকে সময় হলেই ফেরত নিয়ে যাবে সিরাজুল, তার আগে মোটা খদ্দের জোগাড় করে রূপালিকে যতটা সম্ভব টাকা তিনি পাইয়ে দেবেন। শিখিয়ে দেবেন দেহ ব্যবহারের হরেক কায়দা। কীভাবে আরও বেশি টাকা খদ্দেরের কাছ থেকে বার করে আনা যায়, তার কৌশল শেখাবেন। তেমন হলে সিরাজুলের কাছ থেকে কিনে নেবেন রূপালিকে।

একটা মুশকো চেহারার শিষ্য পাহারা দিচ্ছিল ঘরটার সামনে। যদিও ঘরের ভিতর থেকে চিৎকার করলে তা আশ্রমের বাইরে পৌঁছানো কঠিন, তবুও পাহারা থাকে। চিৎকার করলে মুখ বেঁধে রেখে দেয়।

ভবানী দেবীর ইশারায় মুশকো শিষ্য দরজা খুলে দিল। ঘরে আসবাব বলতে একটা তক্তপোশ। রূপালি তার উপরে হাঁটু মুড়ে বসে ছিল। ভবানী দেবী তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

'রাজি হয়েছিস শুনলাম?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বুদ্ধির কাজ করেছিস রে মেয়ে! যে টিচারের কাছে থাকতিস, সে এসব জানলে তোকে আর ফেরত নিত না। ওসব ভদ্দরলোকদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।'

রূপালি কোনও কথা না বলে মাথা নিচু করে থাকল।

'কয়েকদিন ভাল করে খা, ঘুমা। চেহারা একটু ফ্রেশ হলে তোকে পয়লা কাস্টমার দেব। ওষুধ আছে, খাইয়ে দিলে দেখবি জামা খুলতে আর লজ্জা লাগছে না।' স্নেহের সুরে বলতে লাগলেন তিনি, 'জীবনে তো কম রাজা-উজিরকে উদোম হতে দেখিনি। ওই ব্যথাবেদনা যা হওয়ার প্রথম দিনই হবে। তারপর দেখবি রানি হয়ে আছিস। তবে ধনেশবাবু বিবেচক খদ্দের। আমি তাঁকে বলে দেব, টাটকা ফুল— সাবধানে পিষবেন।'

'আমার টাকা হবে? অনেক টাকা হবে?' আচমকা মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল রূপালি।

ভবানী দেবী মুখে উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে আহ্লাদের সুরে বললেন, 'ও মা! মেয়ের কথা শোনো! তোর যা চেহারা, তাতে একটু সেজেগুজে বুক দেখালেই অর্ধেক ছেলের হয়ে যাবে রে মেয়ে! টাকার তো বন্যা বইবে! তা, টাকা নিয়ে কী করবি শুনি? হীরে বসানো কানের দুল কিনবি?'

'সুপারি লাগাব। একজনকে মারব। ওর নাম সুরজ!'

'সে-ই বুঝি তোর প্রেমিক? কাগজে অবশ্যি ওর নামটা লেখেনি। তা টেপাটিপির বেশি কিছু করেনি তো? আমি কিন্তু ধনেশবাবুকে বলব যে, তুই ফুল কুমারী!'

কথা শেষ করে আঁচল থেকে পানমশলার প্যাকেট বার করে মুখে ঢাললেন তান্ত্রিক জ্যোতিষী ভবানী দেবী বাক্‌সিদ্ধা।

(ক্রমশ)

তরঙ্গ তরঙ্গ

গগনেন্দ্রকে নিয়ে শোভা জলপাইগুড়ি চলে এসেছে, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালবাজার রওনা দিলেন গোপাল ঘোষ। শোভা এখন বাপের বাড়িতেই থাকবে। গগনেন্দ্ররও ইচ্ছে কিছুদিন শ্বশুরবাড়ির শহরে কাটিয়ে যাওয়ার। তবে টানা তিন রাত্রি শ্বশুরালয়ে থাকা উচিত নয় বলে সে আস্তানা গেড়েছে দিদির বাড়িতে।

ব্যবসার দিকটা ম্যানেজারের উপর ছেড়ে দিলেও মালবাজারের কাজটায় তাঁর হাজির থাকাটা দরকার বলেই সাতসকালে দু'জন কর্মীকে নিয়ে কাছারির ঘাটে নৌকো ধরেছেন তিনি। তিস্তা এখন পূর্ণযৌবনা। নদী পার হতে হতে গোপাল ঘোষ ভাবলেন তাঁর 'ভারতমাতা'কে আবার জলে নামাবেন। 'ভারতমাতা' তাঁর বজরার নাম। সেটাকে এখনও তেমন কোনও কাজে লাগানো যায়নি। মালবাজারে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা দশটা বেজে যাবে। আজকের রাতটা সেখানে কাটিয়ে কালকেই ফেরার ট্রেন ধরবেন তিনি। এর জন্য তিনি মালপত্র যা নিয়েছেন তা তিনজন কুলি মিলে নৌকোয় তুলেছে। বার্নেশ স্টেশনে সেসব কামরায় তুলে দেওয়ার খুঁটিনাটি নির্দেশ কর্মীদের বুঝিয়ে গোপাল ঘোষ এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন টাউনের আর কে কে এসেছে।

বীরেনকে চোখে পড়ল প্রথমে। সে সিগারেট টানছিল। সেটা লুকাবার চেষ্টা করতেই গোপাল ঘোষ বললেন, 'আহা! খাও খাও! প্রবাসে সবাই সখা। যাচ্ছ কোথায়?'

মাঝে মাঝে মিহিদানার মতো বৃষ্টি হচ্ছিল। গায়ে মাখার মতো কিছু নয়। কিন্তু বীরেনের এক খিদমতগার ছাতা ধরে রেখেছিল প্রভুর মাথায়। বীরেনের নির্দেশ পেয়ে সেটা এবার সে ধরল গোপাল ঘোষের উপর।

'থাক থাক। ছাতা কেন? বেশ লাগছে বৃষ্টি।' গোপাল ঘোষ মৃদু আপত্তি জানালেন। কিন্তু আরেকজন এসে বীরেশের মাথায় দ্বিতীয় ছাতাটি ধরেছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, 'আমি যাচ্ছি মালবাজার।'

'আমি মেটেলি যাব।'

দু'-চার কথার মধ্যেই রেলগাড়ি চলে এল। স্টেশনে যাত্রীর অভাব ছিল না। তবে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী হাতে গোনা। কামরায় দু'জন সাহেব ছাড়া আর কোনও যাত্রী ছিল না। জানলার ধারে বাবু হয়ে বসে গোপাল ঘোষ বললেন, 'একখানা সিগারেট দাও তো ব্রাদার!'

ট্রেন চলতে শুরু করল। তিস্তার গা ঘেঁষে লাইন। বার্নেশ বাজার পেরিয়ে গাড়ি কিছুটা চলার পর দোমোহানিতে থামল। দোমোহানি জংশন স্টেশন, তদুপরি বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের হেড কোয়ার্টার। স্টেশন আর প্ল্যাটফর্ম খুব সুন্দর করে সাজানো। পরপর বেশ কয়েকটা

প্ল্যাটফর্ম। তার একটায় লালমণির হাট যাওয়ার ট্রেন দাঁড়িয়ে থেকে ভসভস করে ধোঁয়া ছাড়ছে। গাড়ি এখানে পনেরো মিনিট দাঁড়াবে। হকারের দল পান-সিগারেট নিয়ে হাঁকাহাঁকি করছিল। লালমণির হাট যাওয়ার গাড়িতে লোক বোঝাই হয়েছে এর মধ্যেই।

'আপনাকে একটা কথা বলার ছিল দাদা!' দোমোহানি ছাড়ার পর একটু ইতস্তত করে বলল বীরেন। গোপাল ঘোষ গাড়ির দুলুনির সঙ্গে শরীর মিলিয়ে দুলছিলেন। তিস্তা আর দেখা যাচ্ছে না। পরের স্টেশন লাটাগুড়ি। একদিকে দূরবর্তী জঙ্গলের রেখা এবং আরেক দিকে বিস্তীর্ণ ঘাসভূমির মাঝখান দিয়ে ঝিকঝিক শব্দে ছুটে যাচ্ছিল বেঙ্গল ডুয়ার্সের মিটার গেজের গাড়ি।

'উপেনের ব্যাপারে আমরা কিছু খবর পেয়েছি।' বীরেন বলল। গোপাল ঘোষ সোজা হয়ে বসলেন। বোঝা গেল যে, বীরেনের মুখে অকস্মাৎ উপেনের প্রসঙ্গ শুনে তিনি বেশ বিস্মিত হয়েছেন।

'উপেনের খবর তোমার কাছে?' তিনি বললেন, 'কোত্থেকে পেলে? সে কোথায়?'

'আপনার কি মনে হয় সে আলিপুরের জঙ্গলে নিরাপদে থাকতে পারে?' সতর্ক গলায় জানতে চাইল বীরেন, 'বক্সা কি জৈন্তির ফরেস্ট সম্পর্কে আমি যা জেনেছি, তাতে কোনও শহুরে মানুষ সেখানে নিরাপদে লুকিয়ে থাকতে পারে না। ইংরেজরা সেখানে জেলখানা সে কারণেই বানিয়েছে।'

'সে আমি জানি।' গোপাল ঘোষ হেলান দিয়ে বসলেন— 'কিন্তু উপেন যে সেখানে বিপদে আছে— এ আমি বিশ্বাস করি না। সেখানে মঘা দেওয়ানের লোকের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে।'

'মঘা দেওয়ান?' বীরেশ যে নামটা আগে শোনেনি, সেটা তার গলা শুনেই বুঝলেন গোপাল ঘোষ— 'মঘা দেওয়ান আলিপুরদুয়ারে কংগ্রেস মুভমেন্টের নেতা। পুলিশের নজরে আছে। সেখানে তার খুব ভাল সংগঠন। তুমি বোধহয় জানো না যে আমি আলিপুরদুয়ার গিয়েছিলাম উপেনের খোঁজ করতে।'

বিস্মিত বীরেন কিছুক্ষণ গোপাল ঘোষের মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর হাঁটুতে চাপড় মেরে বলল, 'তার মানে পুলিশের কাছে পুরো ইনফর্মেশন নেই। ওরা ধরে নিয়েছে যে, আলিপুরের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে গিয়ে উপেন মরে গিয়েছে! আপনি আলিপুরের ব্যাপারটা একটু বলুন তো! কবে গিয়েছিলেন সেখানে?'

গোপাল ঘোষ সংক্ষেপে আলিপুরদুয়ার অভিযানের গল্পটা শোনালেন। উপেন যে শোভার বিয়েতে শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছিল, সেটাও জানালেন। তবে তারপর যে উপেনের আর কোনও খবর আসেনি, সেটাও স্বীকার করলেন বীরেনের কাছে। শোভার বিয়ে হয়েছে বছর দেড়েকের বেশি। উপেন যে এখনও আলিপুরদুয়ারের কাছকাছি কোথাও আছে, সেটা জোর দিয়ে বলার কোনও উপায় নেই। কিন্তু তার বেঁচে থাকা নিয়ে কোনও সংশয় নেই গোপাল ঘোষের মনে।

লাটাগুড়ি স্টেশন এসে গেল। সেখানকার রসগোল্লা যে বিখ্যাত, তা ট্রেন থামামাত্র হকারদের চিৎকারেই মালুম হচ্ছিল। অনেক যাত্রীকে দেখা গেল প্ল্যাটফর্মে নেমে শালপাতার ঠোঙায় রসগোল্লা খেতে। এক-দু'সেরের হাঁড়িও কিনতে দেখা গেল অনেককে। কামরার দুই সাহেবও পরমোৎসাহে মিষ্টি বোঝাই হাঁড়ি কিনে গোপাল ঘোষদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে সেটা দেখালেন। 'এই একটা জায়গায় আমরা ব্রিটিশরা হেরে গিয়েছি বাবু!' জানালেন তাঁদের একজন।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করতেই বীরেন প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য বলল, 'আমার ফ্লাস্কটা তবে খুলি দাদা? ভাল চা আছে।'

'তার আগে সন্দেশ খাও।' সঙ্গে রাখা ক্যাম্বিসের ঝোলা থেকে টিফিন কৌটো বার করতে করতে গোপাল ঘোষ বললেন, 'কেদার মোদকের সন্দেশ।'

পচাগড়ের কেদার মোদকের ঘি আর সন্দেশের নাম জলপাইগুড়ি টাউনের ভোজনরসিকমাত্রেই জানেন। টাউনের কেউ সেখানে গেলে সন্দেশ নিয়ে আসবেই। গোপাল ঘোষের লোক ব্যবসার কাজে পচাগড় গিয়ে গতকাল ফিরেছিল। সন্দেশ সে-ই এনেছে।

'দিন আধখানা।' বীরেন হাত বাড়াল। কেদার মোদকের সন্দেশের সাইজ বেশ বড়। পাঁচটায় এক সের হয়। গোপাল ঘোষ গোটা একখানা বীরেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আরে, এক পোয়া সন্দেশ এ বয়সে খাবে— এ আর এমন কী কঠিন। ট্রেনে চাপলে দেখবে এক-আধ সের সন্দেশ খাওয়া কোনও সমস্যাই নয়।'

বীরেন কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল বাইরে তাকিয়ে। চারপাশের দৃশ্য ম্যাজিকের মতো বদলে গিয়েছে হঠাৎ। ট্রেন চলছে এক অরণ্যের মধ্যে দিয়ে। সে এক গভীর, নিস্তব্ধ অরণ্য। আকাশে মেঘ থাকায় তাকে দেখাচ্ছিল কালচে সবুজ। অচিরেই দেখা গেল, বিপুল ডালপালা আর পাতার আড়ালে হারিয়ে গেল আকাশ। জঙ্গলের এই অংশে সূর্যের আলো ঢোকে না। মনে হচ্ছিল, সন্ধে বোধহয় ঘনিয়ে এল চারপাশে। সুবিশাল, প্রাচীন শালবৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে জানা-অজানা অজস্র গাছের সমাহার— তাদের গা বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল তখন। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে

> নামটা যে আগে শোনেনি, সেটা তার গলা শুনেই বুঝলেন গোপাল ঘোষ— 'মঘা দেওয়ান আলিপুরদুয়ারে কংগ্রেস মুভমেন্টের নেতা। পুলিশের নজরে আছে। সেখানে তার খুব ভাল সংগঠন। তুমি বোধহয় জানো না আমি আলিপুরদুয়ার গিয়েছিলাম উপেনের খোঁজ করতে।'

গিয়েছে এখানে। সেই ভেজা, ছায়াময়, অপার্থিব রহস্যে ভরপুর অরণ্যের দিকে তাকিয়ে মূক হয়ে গেলেন তাঁরা।

টাউনের ডানপিটে আন্দোলনকারীদের কাউকে কাউকে শাস্তিস্বরূপ লাটাগুড়ির জঙ্গলে হাত-পা বেঁধে সন্ধের পর ফেলে দেয় পুলিশ। দিনের আলো ফুটলে স্থানীয় লোকেরা তাদের উদ্ধার করে। কিন্তু কাউকে যদি দিনের পর দিন এমন অরণ্যে আত্মগোপন করে থাকতে হয়, তবে সেটা কতটা কঠিন হতে পারে— তা ভাবার চেষ্টা করছিলেন গোপাল ঘোষ। আলিপুরদুয়ারের জঙ্গল এর চাইতেও গভীর। পাহাড়ের একদম পায়ের কাছে থাকার জন্য সে অরণ্য আরও অনেক দুর্গম, বিপজ্জনক। উপেন কি সত্যি সত্যি এখনও সেখানে লুকিয়ে আছে? তার মতো বুদ্ধিমান ছেলে কি এখনও কোনও নিরাপদ জায়গা খুঁজে নেয়নি?

অরণ্যে পবিত্র বাতাসে কালো ধোঁয়া মিশিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে চলল ট্রেন। নেওড়া নদী আর বড় দিঘি স্টেশন দুটোর পরেই মালবাজার। সেখান থেকে ট্রেন বদলে বীরেন চলে যাবে মেটেলি। মালবাজার স্টেশন বেশ জমজমাট। সেখান থেকে ট্রেন যায় চালসা হয়ে মেটেলি, নাগরাকাটা, বীরপাড়া, হাসিমারা। মালগাড়িও চলে। স্টেশনে সাহেব-মেমের ভিড়। স্টেশনের উলটো দিকে রেলের কয়লার গুঁড়ো দিয়ে তৈরি রাস্তা ধরে কিছুটা এগলেই একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। তার মালিক মাখনবাবুর সঙ্গেই জরুরি কাজ সারতে এসেছেন গোপাল ঘোষ। মাখনবাবুর লোক স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। সাহেবরা যাতে গাড়ি চেপে মাখনবাবুর স্টোরে আসতে পারে, সে জন্যই রাস্তা তৈরি হয়েছে কয়লার গুঁড়োয়।

উপেনের ভাবনা মনের মধ্যে ভাঁজ করে রেখে মালবাজারে মন দিলেন গোপাল ঘোষ।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

চার বাংলোর গান জার্নি

ডুয়ার্সে প্রথম যৌবন কাটিয়ে যাঁরা জীবিকার সন্ধানে প্রবাসী হয়েছেন, তাঁদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় মিশে আছে হরেক কৌতূহলোদ্দীপক এবং সরস কাহিনি। এই রচনায় ধারাবাহিকভাবে মিলবে তেমনই একজন প্রবাসী ডুয়ার্শিয়ানের গল্প, যা আসলে সত্যি। প্রথম পর্বে জলপাইগুড়ি 'কিশোর পিন্টু'র সঙ্গে কুমার শানু এবং সেই সূত্রে বিশ্বের উচ্চতম টয়লেট জড়িয়ে গেল কীভাবে? আদ্যোপান্ত মুচকি হাসিতে মোড়া এই ধারাবাহিক গরমে মন ভাল রাখবে।

সত্যি বলছি... বাপের জন্মে আমি কখনও এত উঁচু মেন'স ইউরিনাল দেখিনি। ব্যবহার করতে গিয়ে প্রত্যেকবার একদম সটান টো-এর উপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে! আর তখন মনে জাগছে একের পর এক প্রশ্ন। এরা কি শুধু অমিতাভ বচ্চনের সুবিধার কথা ভেবেই এমন উঁচু টয়লেট বানিয়েছে? জনি লিভার বা রাজপাল যাদব কি এখানে আসে না কখনও? নাকি তখন তাদের জন্য টুলের ব্যবস্থা করা হয়?

মুম্বইয়ের চার বাংলো এলাকায় রেকর্ডিং স্টুডিয়ো সানা, যার মালিক কেদারনাথ ভট্টাচার্য, ওরফে কুমার শানু। যেখানে বাকি আর সব ব্যাপারস্যাপার একদম-ঝাঁ চকচকে হলেও সন্ধের পর মশার তাক লাগানো ঝাঁক, রীতিমতো আফ্রিকান আদিমতা। আর কপালটাও এমন, যে গায়ক-গায়িকারা সবাই আমাদের সময় দিচ্ছেন রাতের বেলাতেই। কে জানত বাবা, মুম্বইতে গান রেকর্ডিং করাতে এলে রক্তদান করে যাওয়া এমন বাধ্যতামূলক!

উত্তরবঙ্গ ছেড়ে বছর পাঁচেক হল আমি কর্মসূত্রে কলকাতায়। মনের মধ্যে তখনও চনমনে তাজা রয়েছে মিউজিক ডিরেক্টর নদিম-শ্রবণের সঙ্গে জুটি বেঁধে গাওয়া কুমার শানুর একটার পর একটা হিট গান।

সেইরকম সময়ে বাংলা সিনেমার গান রেকর্ডিং-এর সূত্রে মুম্বইয়ের মিউজিক রেকর্ডিং চাক্ষুষ দেখার প্রথম সুযোগ এল। তা-ও আবার সেই কুমার শানুর স্টুডিয়োতেই! হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে উঠে প্রথম থেকেই সে কী উত্তেজনা আমার! আর তারপর, সারা যাত্রাপথ জুড়ে শুধু মনে পড়ে যাচ্ছিল স্কুল ও কলেজজীবনের নানা পুরনো কথা। এই গান জার্নি শুরুর বীজটা লুকিয়ে রয়েছে যার গভীরে।

কিশোর পিন্টুকে কলেজে কেউ কেউ 'পিশোর চিন্টু' বলেও ডাকত। কুমার শানু বাজার মাত করার অনেক আগে থেকেই আমরা এসি কলেজের ক্যান্টিনে দু'ঠোঁট সরু করে নাকের ভিতর দিয়ে তীব্র গান বার করতে দেখেছি ওই পিন্টুকেই, যে কিনা কিশোরকুমারের অন্ধ ভক্ত। কুমার শানুর নাসিকা মডেলমার্কা গায়কির আদি স্বত্ব দাবি করার ন্যায্য হক যদি কারও থেকে থাকে, তবে সে হল আমাদের সেই পিন্টু।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য আরও একজন ভক্তর কথাও বলতে হয়। জুবিলি পার্কের ধারে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কর্মীদের ছোট কাঠের বাড়িগুলির মধ্যে কোনও একটায় বাস করত সে। অশোকভাই। নেহাত মাঝারি উচ্চতা আর গায়ের কালো রঙে মার খেয়ে গিয়েছিল। নইলে কান-ঢাকা চুলের স্টাইল, বড় বড় দিঘল চোখ এবং ব্যারিটোনে সে পাক্কা অ্যাংগ্রি ইয়াং ম্যান অমিতাভ। আর আমাদের অনুরোধে যখন গলা ঝেড়ে নিয়ে ওই ব্যারিটোনে কিশোরকুমার ধরত, বাদলভাইয়ের চায়ের দোকানের ধারের বেড়া হামেশাই থিরথির করে কেঁপে উঠত

ওর ভোকাল ফ্রিকোয়েন্সির ধাক্কায়!

এই ছিল আটের দশকে জলপাইগুড়িতে ইন মিউজিক সিন। যত হিট গান— সব অমিতাভ আর মিঠুনের লিপে। আর গলা অবধারিত কিশোরকুমারের। টিভি নেই, ইন্টারনেট নেই, ডাউনলোড নেই। কিন্তু তবু একমেবাদ্বিতীয়ম্ বিবিধ ভারতী রেডিয়ো স্টেশনের কল্যাণে কিশোরকুমার একদম কণ্ঠস্থ-ঠোঁটস্থ উত্তরবাংলার কোণে কোণে।

একবার মনে আছে, কলেজলাইফে মূর্তি নদীর ধারে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে বন্ধুরা মিলে গানবাজনা করে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে এসে দাঁড়িয়ে আছি চালসা মোড়ে। কোনও ট্রাক ধরে তার ডালায় চেপে ময়নাগুড়ি আসব।

কোলে গিটার নিয়ে একপাশে বসে টুংটাং করছি আপন মনে। একজন মদেশিয়া তরুণ এসে পাশে বসল। এক ঝলক দেখেই বুঝলাম, আশপাশের চা-বাগানের শ্রমিক হবে। অনুরোধ করল, 'জমির' ছবির ওই গানটা বাজাও না... অমিতাভ বচ্চন যেটা গেয়েছে... 'তুম ভি চলো, হম ভি চলে...'

সেই ছেলেটি অমিতাভ বচ্চনের ভক্ত। একের পর এক সিনেমা থেকে হিট গান ফাটাফাটি গেয়ে দিচ্ছে। আজ মনে পড়তে ভাবি, কোথায় তখন সা-রে-গা-মা-পা কি ইন্ডিয়ান আইডল! নয়ত ওই ছেলেই হয়ত...

তবে আসল মজা হল, কিছুতেই তাকে বিশ্বাস করানো যায় না যে অমিতাভ বচ্চন নয়, এসব গান কিশোরকুমারের গাওয়া। 'রঙ্ বরসে' বা 'মেরে পাস আও, মেরে দোস্তোঁ' ইত্যাদি গানের কথা বলে তাকে বোঝাতে চাইলাম, এগুলো হল অমিতাভ বচ্চনের আসল গলায় গান। কিন্তু কে শোনে কার কথা! রেগেমেগে ঝগড়া করে সে উঠেই চলে গেল!

উনিশশো সাতাশিতে কিশোরকুমার মারা গিয়েছিলেন। তখন ক্লাস ইলেভেন কি টুয়েল্ভে পড়ি। বোধহয় সেই বছরেরই শেষ দিকে কোনও একদিন জুবিলি পার্কের সন্ধের আড্ডা থেকে হেঁটে ফিরছি কদমতলার দিকে। টেম্পল স্ট্রিট ক্রসিং পেরতেই কানে এল ঝ্যাং আর টিস টিস শব্দ। মনে জাগল বিপুল পুলক। আহা! রেনবো অর্কেস্ট্রা প্র্যাকটিস করছে। চল চল দেখি!

সন্ধের বাতাসে তখন ভেসে এল আগে কোনও দিন না-শোনা একটি গানের কলি... 'অমর শিল্পী তুমি কিশোরকুমার...'

পা চালিয়ে রূপশ্রী সিনেমা হলের উলটো দিকের সরু গলিটার পানে যেতে যেতে ভাবছি, কিশোরকুমারকে নিয়ে গান বেরিয়ে গেল? দারুণ নতুনত্ব তো! কই, রফি, মুকেশ... এদের কারও বেলায় তো এমন হয়নি!

গলিতে কয়েক পা ঢুকতেই বাঁ পাশের

> অবাক বিস্ময়ে দেখা, কী করে নতুন গান তোলেন কুমার শানু, অভিজিৎ, বাবুল সুপ্রিয় বা উদিতনারায়ণের মতো শিল্পীরা। আর এর পর কী করে গানের কথা আর সিনেমার সিচুয়েশন বুঝে সেই গানে এক্সপ্রেশন দেন। একটু একটু করে কীভাবে প্রাণ পায় সিনেমার গান। সেই গান জার্নিতে আসব।

বাড়িটা, যার জাল-ঘেরা বারান্দায় প্র্যাকটিস চলছে। এখন যাকে ব্যান্ড বলে, তখন সবাই বলত অর্কেস্ট্রা।

দু'শো পাওয়ারের একটা বাল্ব ঝুলছে বারান্দার ছাদে। আর সরু জায়গাটার মধ্যে বড় বড় স্পিকারের মাঝে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ঠাসাঠাসি করে বসে আছে ব্যান্ড মেম্বাররা, যাদের মাত্র কয়েকজনকেই চিনি। গিটারে বাপ্পা, অক্টোপ্যাডে রাসেল, কি-বোর্ডে রুমনদা। অন্য সময় পথেঘাটে দেখা সেই চেনা চেহারাগুলোই এখন সিনেমার পরদার নায়কদের মতো অসাধারণ। গানবাজনার শব্দে ভিড় জমিয়ে তোলা উৎসাহী জনতা রীতিমতো ঝুলছে বারান্দার জাল ধরে। চোখে-মুখে প্রত্যেকেরই অসীম কৌতূহল।

মাইক হাতে গান গাইছে একটি নেপালি ছেলে। ভিড়ের মধ্যে কোনওরকমে ঠেলেঠুলে মাথা ঢোকাতে পেরে সেটা দেখলাম। সে তখন তিনরকম সুর করে একটাই লাইন রিপিট করছে... 'তোমাকে জানাই প্রণাম... তোমাকে জানাই প্রণাম... তোমাকে জানাই প্রণাম...' কেউ একজন বলল, ওর নাম কৃষ্ণ। তখন আমি তাকেই জিজ্ঞেস করলাম, আর গানটা? গানটা কার? রেনবো অর্কেস্ট্রা কিশোরকুমারের স্মৃতিতে গান তৈরি করল নাকি?

সেই ব্যক্তি চোখ গোল গোল করে আমাকে আগাপাশতলা এমন দেখল, যেন রুই মাছের গায়ে মুরগির পালক দেখছে! তারপর পানে রাঙানো লাল দাঁত দেখিয়ে বলল, কুমার শানুর নাম শোনোনি? কুমার শানু?

আমার চেতনায় সেই হল শানু যুগের শুরু। মিঠুন চক্রবর্তীর পর বলিউডের এই আরেক বাঙালিকে এর পর 'গুরু' বলার চলটা রপ্ত করে নিতে লাগল আমাদের বয়সিরা। তাঁর প্রথম বাংলা অ্যালবামের 'অমর শিল্পী তুমি' এবং 'কত যে সাগর নদী' কলেজজীবনে আমাদের আড্ডায় সুপারহিট গান হয়ে গেল। সুযোগ পেলেই গলা ছেড়ে সমস্বরে গেয়ে উঠে সন্ধের কদমতলা চত্বর সরগরম করে তুলতাম আমরা।

পরের দশ বছরে তখনও আসা বাকি হিন্দি ছবিতে তাঁর ডজন ডজন হিট গান। নয়ের দশকে ভারতজোড়া 'কুমার শানু' উন্মাদনার প্রতি একটা চমৎকার ট্রিবিউট আছে, এই কয়েক বছর আগে রিলিজ হওয়া যশ রাজ ফিল্মস-এর 'দম লগাকে হেইসা' ছবিতে, যেখানে নায়ক হরিদ্বারে একটা ক্যাসেটের দোকান চালায়, আর কুমার শানু তার প্রিয় গায়ক।

তার মানে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল ভাবুন! কিশোরকুমারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানানো গানটির মাধ্যমে কুমার শানুর উত্থান শুরু। একজন গায়ককে বিষয়বস্তু করে আরেক গায়কের গান গাওয়াও সেই প্রথম।

আবার, কুমার শানু যখন প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে তাঁর সেরা সময়টা পিছনে ফেলে চলে এসেছেন, তখন স্বয়ং তিনিই হয়ে গেলেন বলিউডি ছবির কাহিনির অংশ। এটাও কিন্তু কোনও প্লেব্যাক সিঙ্গারের ক্ষেত্রে এই প্রথম!

এই যাঃ! ছিলাম কোথায়, আর চলে এলাম কোথায়!

মুম্বই শহরে অন্ধেরি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে চার বাংলোয় স্টুডিয়োর ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়িটার পিছনে একটা বড়সড় জঙ্গলে ঢাকা জলা, যার ওপারে লোখন্ডওয়ালার আকাশচুম্বী হাইরাইজগুলো দেখা যাচ্ছে।

তিনতলা বাড়ির ছাদের উপর একদিকে শেডের নিচে ক্লায়েন্টদের বসার ব্যবস্থা। কাজের ফাঁকে চা, ধূমপান, লাঞ্চ ও ডিনার ওখানেই। এবং ছাদের আরেক দিকে দেওয়ালের গাছে সারিবদ্ধ ওই 'লম্বু' টয়লেটের স্টল বা স্থল, যেটাই বলুন। আগামী তিন-চার দিন প্রায় রোজই দশ ঘণ্টা করে কাটবে এই স্টুডিয়োতে নাইট শিফ্‌টে।

একদিকে জলাভূমি, মশাদের অকাতরে রক্ত বিতরণ। কমবেশি তিন হাজার সাতশো তেইশটি মশা হত্যা।

আরেক দিকে অবাক বিস্ময়ে দেখা, কী করে নতুন গান তোলেন কুমার শানু, অভিজিৎ, বাবুল সুপ্রিয় বা উদিতনারায়ণের মতো শিল্পীরা। আর এর পর কী করে গানের কথা আর সিনেমার সিচুয়েশন বুঝে সেই গানে এক্সপ্রেশন দেন। একটু একটু করে কীভাবে প্রাণ পায় সিনেমার গান।

সেই গান জার্নিতে আসব। তবে আজকে নয়। এর পরের দিন।

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

জলপাইগুড়ির ‘টু লিভস অ্যান্ড এ বাড’-এর জার্নি বান্দাপানি চা-বাগান

প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ হাতে কতকগুলো ছেলেমেয়ের দল আমাদের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটছিল। ওদের ক্যারিব্যাগ ভরতি চা-পাতা, ফুল। এগুলো খাওয়া যায়। ভেজে বড়া করে খাওয়া হয়। ভালই স্বাদ। অবশ্য এখানে কে-ই বা পোলাও-কোর্মা খাচ্ছে। ডাল-ভাতটুকুও ঠিকমতো জুটছে না কিনা। হঠাৎ আকাশে একটা ঘুড়িকে ভোকাট্টা হয়ে গোঁত্তা খেয়ে পড়তে দেখে ওদের দল হইহই করে নেমে পড়ল রাস্তার পাশের মাঠে। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। নীল আকাশটা আজ সত্যিই খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। মেঘগুলোও তাতে সুন্দর ঘুড়ির মতো। যেন প্রকৃতই একটা দিন। বড়দিন।

আমাদের গাড়ির সামনে সামনে মোটরসাইকেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ‘g-sec’-এর দুজন লোক। g-sec একটি NGO। কিছু দূর রাস্তা অতিক্রম করতেই চোখে পড়ল একটা সাইনবোর্ড। অত্যন্ত ঝলসানো তার রং। অনেক রোদ-বৃষ্টি-হাওয়া খেলে গিয়েছে তার গায়ে। তাতে লেখা— ‘ইউ আর নাও ইন বান্দাপানি টি এস্টেট, বীরপাড়া, জলপাইগুড়ি’। আমরা এতক্ষণে ঢুকে পড়েছি। Two leaves and a bud-এর ড্রিম প্রোজেক্টের আরও এক পদক্ষেপের আর কিছুটা বাকি। এই সেই চা-বাগানগুলোর একটি, যা আমরা এত বছর ধরে খবরের কাগজের পাতাতেই খালি পড়ে এসেছি। স্বচক্ষে দেখার একটা সত্যিই আলাদা অভিজ্ঞতা আছে। একটা বোধ জাগে। লকআউটের মতো কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত এই চা-বাগান বান্দাপানি। বসে আছে পাহাড়ের কোলে। এখানকার পাহাড় থেকে কোনও দিন ফেরেস্তা নেমে আসেনি। বেশ বড় চা-বাগান নিঃসন্দেহে। চার বছরের অযত্নে অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে এর সবুজাভা, এর সৌন্দর্য, এর বিকাশ। এখনও মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক নিয়মে চা-পাতা, ফুল হয়। সেগুলোই ছোটরা সংগ্রহ করছে দল বেঁধে। বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে মা কি খুশি হবে? আজ খাওয়া হবে? বাবার নেশার টাকা হবে? ছোটরা এখানে অনেক আগেই বড় হয়ে গিয়েছে। অনেক বড়। ওই পাহাড়টার মতোই এখানকার মানুষ অনেক বড়।

ভাঙাচোরা রাস্তায় ধুলো-গর্ত অতিক্রম করে আমাদের জিপ এগিয়ে চলেছে গন্তব্যাভিমুখে। একসময়ে গাড়ি থামল। ৭ নং লেবার লাইন। ওই ভদ্রলোক দু’জন আগেই এখানকার শ্রমিকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আজ আমরা আসছি। কোনও সাজুগুজু করা সান্তাক্লজ নয়, সত্যি সত্যিই কিছু শীতবস্ত্রসমৃদ্ধ উপহারের ডালি নিয়ে।

চালকও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করলেন। সমস্ত আদিবাসী-রাজবংশী-নেপালি শ্রমিক ভিড় করে এলেন। মূলত শিশুদেরকেই সর্বাগ্রে শীতবস্ত্র প্রদান করা হবে— এই জন্য আমি চিৎকার করে সমস্ত শিশুকে একটা লাইন বরাবর দাঁড়াবার কথা ঘোষণা করলাম। ছোটরা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর শুরু হল বস্ত্র বিতরণ। বিতরণ কর্মরতা অদ্রিজা, বৃষ্টি নাম্নী মেয়েরা অত্যন্ত সুপটু হাতে দান শুরু করল। শিশুরা তো ‘দান’ কী তা বোঝে না। তারা চাইতে জানে না। মায়ের কাছে শিশু যেভাবে দু’হাত বাড়িয়ে দেয় জামা পরিয়ে দেওয়ার জন্য, শিশুরা সেভাবেই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে দেখে মুহূর্তের মধ্যে আমার গলার কাছে কেমন একটা অন্যরকম অনুভূতি দলা পাকিয়ে উঠতে চাইল। আমি ছবি তোলার দায়িত্বে ছিলাম। কিন্তু কয়েকটা শিশুর এরকম আচরণ দেখে ক্যামেরা নামিয়ে ফেললাম।

এটা কী দেখছি? সরল, সত্য একটা দৃশ্য! একটি শিশু চাইছে তাকে জামা পরিয়ে দেওয়া হোক। নাহ্! এ অনুভূতি লিখে ফেলার নয়। কিছুতেই পারব না। অনুভূতিটাকে মনের একান্তে নিয়ে শুধু ভাল লাগাতেই পারব। আমার কত আছে, কত অজস্র জামাকাপড়, সব ক'টা আমি পরিও না ঠিকঠাক। আর ঠিক একইভাবে এদের গায়ে শীতবস্ত্রই নেই, এরাও পরে না। আমার অতিরিক্তটা যদি এদের দিয়ে দু'জনেই সমান হয়ে উঠি তাহলে কি খুব ক্ষতি হবে আমার? মার্ক্সবাদে এই কথাটাই ছিল না? সারাজীবনে আমি কিছুই হয়ত করতে পারব না ওদের জন্য। কিন্তু এই যে দু'জন মানুষ আমার জামা পরে ভাল থাকবে— এটা কি আমার কাছে কম?

জামা পরিয়ে দেওয়ার পর বাচ্চাটি যখন হাসি হাসি মুখ করে ছুট্টে বেরিয়ে গেল লাইন থেকে, তখন আবার ক্যামেরা তুললাম। এই খুশির দৃশ্য তো বন্দি করতেই হবে!

ওখানকার মানুষের চোখ লক্ষ করছিলাম। পুরুষমানুষরা নেশায় চুর। পেটে ভাত ঠিকঠাক না জুটলেও নেশার সামগ্রীটা যে এরা কোত্থেকে জোটায়, কে জানে! চুপচাপ দাঁড়িয়ে লক্ষ করছি বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান এবং সুযোগ বুঝে ছবি তুলছি, জামাও এগিয়ে দিচ্ছি।

গত বছরের মাঝামাঝিতে এই প্রোজেক্ট ওয়ার্ক শুরু হয়েছে। শুরু থেকে, মানে জন্মলগ্ন থেকেই আমি আছি। আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে 'Two leaves and a bud'। এর কর্ণধার অর্পিতা বাগচি নিজের হাতে গড়ে তুলছেন এই বিশাল কর্মকাণ্ড। যাতে একটুও আঁচড় না পড়ে, সে বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল তিনি। হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন বড় মাপের মানুষ। বীরপাড়া চা-বাগানের কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন ইন্ডিয়ান টি বোর্ডের অধিকর্তা রামভরত শর্মা। 'Two leaves and a bud' কাজ করতে চাইছে যাদের নেই, কিচ্ছু নেই, তাদের উপর। অর্পিতাদি বারবার বলেন, 'কাদের জন্য কাজটা করছি? না, মানুষের জন্য। না খেতে পাওয়া, বন্ধ হয়ে যাওয়া চা-বাগানের সেইসব ক্ষুধার্ত, যন্ত্রণাবিকৃত মানুষের স্বার্থে, সেইসব মেয়ের জন্য, যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় সসম্মানে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও অভাবের জন্য— পরিবারের স্বার্থের জন্য হেল্‌থ ওয়ার্কার হয়ে যাচ্ছে, আমার কাজ তার স্বার্থপূরণ।' চার্লি চ্যাপলিনের 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' সিনেমার শেষ দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে এই যান্ত্রিক জীবনে— যান্ত্রিক যুগে দাঁড়িয়ে, 'You are not a machine. You are a man. You have a loveable humanity, you don't hate. Only the unloved hate. The unloved the unnatural.'

দূর থেকে ছুটতে ছুটতে শিশুরা আসছে খবর পেয়ে— এখানে জামা দেওয়া হচ্ছে। ওদের খুশি মুখ এই চা-বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়াতেও হারিয়ে হয়নি। ওরা আরও আরও খুশি থাকুক। ওরা তো এইটুকু জীবনে জন্মে শৈশবটুকু বাদে কিছুই পায়নি, পাচ্ছে না। ঠিকমতো খেতে পারছে না, পড়তে পারছে না, জামাও পাচ্ছে না। অন্তত এই সংস্থার মানুষরা যে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, আর ওরা সেই কঙ্কালসার হাতে সেই হাত আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে— এখানেই আমাদের তৃপ্তি, শান্তি। আর সেখানেই সফল এই ড্রিম প্রোজেক্ট— 'Two leaves and a bud'।

গত ২৫ ডিসেম্বরের এই কাজে আমি স্বয়ং উপস্থিত থেকে বুঝেছি, 'টু লিভস অ্যান্ড এ বাড'-এর কাজ সুদূরপ্রসারী। সত্যি সত্যিই একটা কাজ। গীতায় যেমন উল্লেখ আছে— 'ফলের আশা না করিয়া কর্ম করিয়া যাও', এই প্রকল্পও ঠিক সেই ছিরিছাঁদে গড়া। গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত আরও বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন মাপের মানুষরা স্বেচ্ছায় এতে যুক্ত হয়েছেন এবং কর্মপ্রণালী আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হয়েছে। মূলত ডুয়ার্সের সমস্ত খোলা ও বন্ধ হয়ে যাওয়া চা-বাগানের সেইসব শিশুর উপর ফোকাস করে এই কাজ, যারা পড়াশোনা করতে পারছে না নিছকই অর্থের অভাবে। যাদের ঘরে শান্তি ও পেটে ভাত নেই, তারা কীভাবে মস্তিষ্ক চালনা করবে? তাদের পরিবারই বা সেটা মেনে নেবে কেন? যেখানে ভাতের টাকা নেই, সেখানে শিক্ষার কোনও মূল্য নেই— এমনই চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছে ডুয়ার্সের এইসব বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা ধুঁকতে ধুঁকতে চলতে থাকা চা-বাগানের মানুষদের। উদাহরণস্বরূপ একটা নির্মম সত্য তুলে ধরি— কুমারগ্রাম ব্লকের এক চা-বাগানের এক শ্রমিকের মেয়ে কিছুদিন আগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। কোথায় তার উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কথা, কিন্তু পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য অন্য উপায় না দেখে সে দেহব্যবসায় নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে। একটি জ্বলজ্বলে ভবিষ্যৎকে গলা টিপে খুন করেছে নেহাত পেটের দায়ে। তার কি ওই কাজই করার ছিল? এই হচ্ছে আমাদের ডুয়ার্সের বর্তমান হালহকিকত। এই সমস্ত করুণ দৃশ্য হাজারে হাজারে ছড়িয়ে আছে ডুয়ার্সের আনাচকানাচে।

এই সমস্ত ছেলেমেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব তুলে নিতে চায় 'টু লিভস অ্যান্ড এ বাড'। যদিও কাজটি এলআইসি-র মাধ্যমে, তবুও কোনও লভ্যাংশ ছাড়াই নিঃশর্তে সেইসব ছেলেমেয়ের মাসিক পেনশনের বন্দোবস্ত করাই মূল লক্ষ্য এই প্রকল্পের। শুধু পড়াশোনার জন্য টাকা দিয়েই খালাস হওয়াই নয়, সেই সন্তানের নিরাপত্তার দায়িত্বও তুলে নেওয়া হবে। 'একটি গাছ একটি প্রাণ' বলে একটা কথা আছে বাংলায়। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে— একটি ইনশিয়োরেন্স একটি শিশুর লেখাপড়ার মূলধন। যিনি বিনিয়োগ করবেন, তিনি নিজের স্বার্থেই করবেন। কিন্তু বিনিয়োগটা যদি 'টু লিভস অ্যান্ড এ বাড'-এর অধীনে করা হয় তাহলে এজেন্টের লভ্যাংশ বাবদ যত প্রাপ্য হয়, তার পুরোটাই সেইসব শিশুকে দেওয়া হবে। একটি আর্থিক নিরাপত্তা, যা তাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ এটি।

ইতিমধ্যেই প্রচুর মানুষ এতে যুক্ত হয়েছেন। আরও মানুষ যুক্ত হচ্ছেন এবং অজস্র শুভাকাঙ্ক্ষী হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আগামী মাসের মধ্যেই আর্থিক সহায়তা করবার জন্য জলপাইগুড়িরই একটি শিশুকে গ্রহণ করছে 'টু লিভস অ্যান্ড এ বাড'— অনেক বড় এবং কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই। এই প্রকল্পের এবং তার উদ্যোক্তার দীর্ঘ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করি।

রঙ্গন রায়

গরমকালে ছানি অপারেশন করুন নিশ্চিন্তে

মে মাসের দুপুর ১২টা। বাইরে তখন গ্রীষ্মের গনগনে রোদ্দুর। দিশা চোখের হাসপাতালের বহির্বিভাগে ডাঃ ভাস্কর ভট্টাচার্যের ঘরের সামনে প্রতিক্ষারত বেশ কিছু রুগী। এদেরই একজন লতিফভাই — আব্দুল লতিফ। পেশায় তিনি মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার। কাজ করেন সূদুর মধ্যপ্রাচ্যের (কুয়েত) একটি তৈলশোধনাগারে। বছরের এই সময়টাতেই - একমাসের জন্য তিনি এদেশে মা'র সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মা থাকেন কল্যাণীতে — তিনি আগেকার দিনের মহিলা, তাঁর কাছে অবশ্য বিদেশে গিয়ে ছেলের কাছে থাকার থেকে, এদেশে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকাটাই বেশি গ্রহণযোগ্য। এই তো মাত্র একমাস ছেলে, বৌমা এবং নাতি'র সঙ্গে দেখা হয়!

অনেকদিন থেকেই লতিফভাই শুনছিলেন, মা'র নাকি চোখের কিছু অসুবিধা হচ্ছে — তাই এবার এই অসুবিধাটার কিছু সমাধান করাই তার ইচ্ছে — সেই জন্যই তিনি আজ দিশায় মা'কে নিয়ে চোখ পরীক্ষা করাতে এসেছেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর, লতিফভাই-এর মার নাম ধরে ডাক হল এবং তিনি মাকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর ঘরে প্রবেশ করলেন। বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার পর — ডাক্তারবাবু বললেন মাসিমা, আপনার দুচোখেই ছানি পড়েছে, এবার এটার কিন্তু চিকিৎসা করতে হবে। আর ছানির কিন্তু অপারেশন ছাড়া কোনও চিকিৎসা নেই, আপনার ছানির যা অবস্থা, তাতে চশমা দিয়েও কোনও উন্নতি হবে না।

মাসিমার মুখ দেখে ডাক্তারবাবুর মনে হল, মাসিমা বোধহয় এই ব্যাপারটার জন্য অতটা প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু লতিফভাই বোধহয় এটাই ভাবছিলেন - বয়স হয়েছে, ছানি ছাড়া আর কীই বা হবে — আর তিনি বিলক্ষণ জানেন, ছানির অপারেশন ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

মাসিমা - তাহলে ডাক্তারবাবু, আমার ছানিই হয়েছে?

ডাঃ - হ্যাঁ, আপনার দুচোখেই অনেকটা ছানি পড়েছে, এবং এটার জন্যই আপনি কম দেখতে পাচ্ছেন।

লতিফ - এখন ডাক্তারবাবু আমাদের কী করণীয়?

ডাঃ - ছানি যখন পড়েছে, আর দৃষ্টিশক্তি যখন এতটা কমে গেছে, অপারেশন ছাড়া কিন্তু কোনও উপায় নেই।

মাসিমা - অপারেশনটা কি এখনই করতে হবে?

ডাঃ - দেখুন, আমাদের যখন জল তেষ্টা পায়, তখনই তো জল খাই। আপনি ছানির জন্য দূরের জিনিস এতটা কম দেখছেন, আপনার দৈনন্দিন জীবনে কাজকর্মে যখন অসুবিধা হচ্ছে, তখন অপেক্ষা করাটা ঠিক নয়। যতটা তাড়াতাড়ি করা যায়, ততটাই ফল ভাল হবে।

মাসিমা - না, এখনতো গরমকাল, সকলে বলে - গরমে নাকি অপারেশন করাটা ঠিক নয়, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

ডাঃ - হ্যাঁ, এই ধারণাটা আগে ঠিক ছিল — যখন ছানি অপারেশন প্রচলিত, পুরানো পদ্ধতিতে হত - তাতে চোখে eyepad লাগিয়ে রাখতে হত, একমাস চান বন্ধ রাখতে হত, অনেক রকম বিধি নিষেধ মেনে চলতে হত। এখন তো আর এসব হয় না। আধুনিক ফেকো (Phacoemulsifi-cation) পদ্ধতিতে মাত্র তিন-চারদিন বাদেই সব আবার আগের মতো। অপারেশন-এর পরে চোখে কোনও Pad লাগিয়ে রাখারও প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র তিন/চারদিন চোখে জলের ঝাপটা'টা দেওয়া যায় না— এটা ছাড়া, আপনি মাথার পেছনদিকে জল দিয়ে চান করতে পারবেন, গায়ে যত খুশি জল ঢালতে পারবেন, স্বাভাবিক জীবনযাপনে কোনও বাধাই নেই।

লতিফ - হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, লোকেদের বোধহয় ধারণা আছে, শীতকালে কাটা জায়গাটা বোধহয় তাড়াতাড়ি শুকোয়— এটা কি ঠিক?

ডাঃ - সত্যি বলতে কি, চোখের ছানি অপারেশন-এর ক্ষেত্রে এটা একদমই ঠিক নয়। আসলে ছানি অপারেশনএ যেখানে কাটা হয় (সে যত ছোট কাটাই হোক না কেন), সেই জায়গাটা সবসময়েই চোখের জলে ভিজে থাকে, শুকনো থাকার কোনও ব্যাপারই নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও খুবই তাড়াতাড়ি সেই ঘা শুকিয়ে যায়।

মাসিমা - আচ্ছা, গরমে তো ঘাম হয়, সেই ঘাম চোখে পড়লে ক্ষতি হতে পারে না?

ডাঃ - না, তাঁরও কোনও সম্ভাবনা নেই। যে কোনও লোকের চোখে ঘাম পড়লে একটু জ্বালা করে ওঠে, এখানেও তাই হয় — আর তিন/চার দিন বাদে তো আপনি চোখে জল দিতেই পারছেন, তখন জল দিয়ে ধুয়ে নেবেন। শুধু ঘাম পরাই নয়, অপারেশন-এর দুই দিন পরে আপনি উনুনের ধারে বসে রান্নাও করতে পারবেন — তাতেও কোনও বাধা নেই। এসবই অবশ্য আধুনিক Phacoemulsifi-cation পদ্ধতিতে ছানি অপারেশন-এর পরই সম্ভব।

সত্যি কথা বলতে কি মাসিমা, আপনি আপনার ছেলের কাছে শুনতেই পাবেন, উনি যেখানে কাজ করেন, সেখানে শীত বলে কিছুই নেই— সারা বছরই গরমকাল। তাই বলে কি সেখানকার লোকেরা আর অপারেশন করায় না? আর শুধু মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো কেন? আপনি যদি আমাদের দক্ষিণভারত বা পশ্চিমভারতের কথাও ধরেন, সেখানেও বা সত্যিকারের শীতকাল কোথায়? সেখানেও গরমকালে হাজার হাজার লোকের ছানি অপারেশন হচ্ছে এবং কোনও অসুবিধা ছাড়াই।

— আসলে গরমকাল বা শীতকাল নয়, ছানি অপারেশন-এর সময় নির্ধারিত হয়, ছানি কতটা পরেছে, রুগীর কতটা অসুবিধা হচ্ছে, তার বাড়ির লোকেদের সুবিধা অসুবিধা কতটা ইত্যাদি বিষয়ের উপরে, সেখানে কাল নিমিত্ত মাত্র।

শুনে মাসিমা অবাক হবেন, দেরিতে হলেও পূর্বভারতের লোকেরা এবার গরমকালেও অপারেশন করাচ্ছে— এবং ভালও থাকছে। আমাদের এই দিশাতে গত বছর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৬০০০ লোক ছানি অপারেশন করিয়েছেন, এবং এই বছর শুধু এপ্রিল মাসেই সেই সংখ্যাটা ২০০০-এর কাছে। উপরওয়ালার কৃপায় সবাই ভালই আছেন — আপনিও নির্ভয়ে অপারেশন-এর তারিখ নিয়ে নিন, আপনারাও কোনও অসুবিধা হবে না।

এ কাহিনির আর খুব একটা অবশিষ্ট থাকবার কিছু নেই কিন্তু তবু শেষ করার আগে খবরটা বোধহয় বাকি রাখাটা ঠিক নয় — মাসিমার অপারেশন হয়ে গেছে। তারপর ওনার ফাইনাল চেকআপ হয়ে চশমাও পেয়ে গেছেন — উনি এখন খুব খুশি। আর যাবার আগে বলে গেছেন, অন্য চোখটার অপারেশন তিনি সামনের বছর গরমেই করাবেন। কারণ সেই সময়টাতেই বিদেশ থেকে ছুটি কাটাতে আসে তার ছেলে এবং সঙ্গে বৌমা ও নাতি-নাতনিরা। বছরের সেই সময়টাতেই তার বাড়ি শিশুদের কলকাকলিতে পূর্ণ থাকে, সেই সময়েই তিনি জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেন। ততদিন পর্যন্ত জীবন কাটাবার জন্য তাঁর একটা চোখই যথেষ্ট।

ডাঃ ভাস্কর ভট্টাচার্য

সৌজন্যে দিশা আই হাসপাতালের মুখপত্র 'সুস্থ দিশা'

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-৮। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-2 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

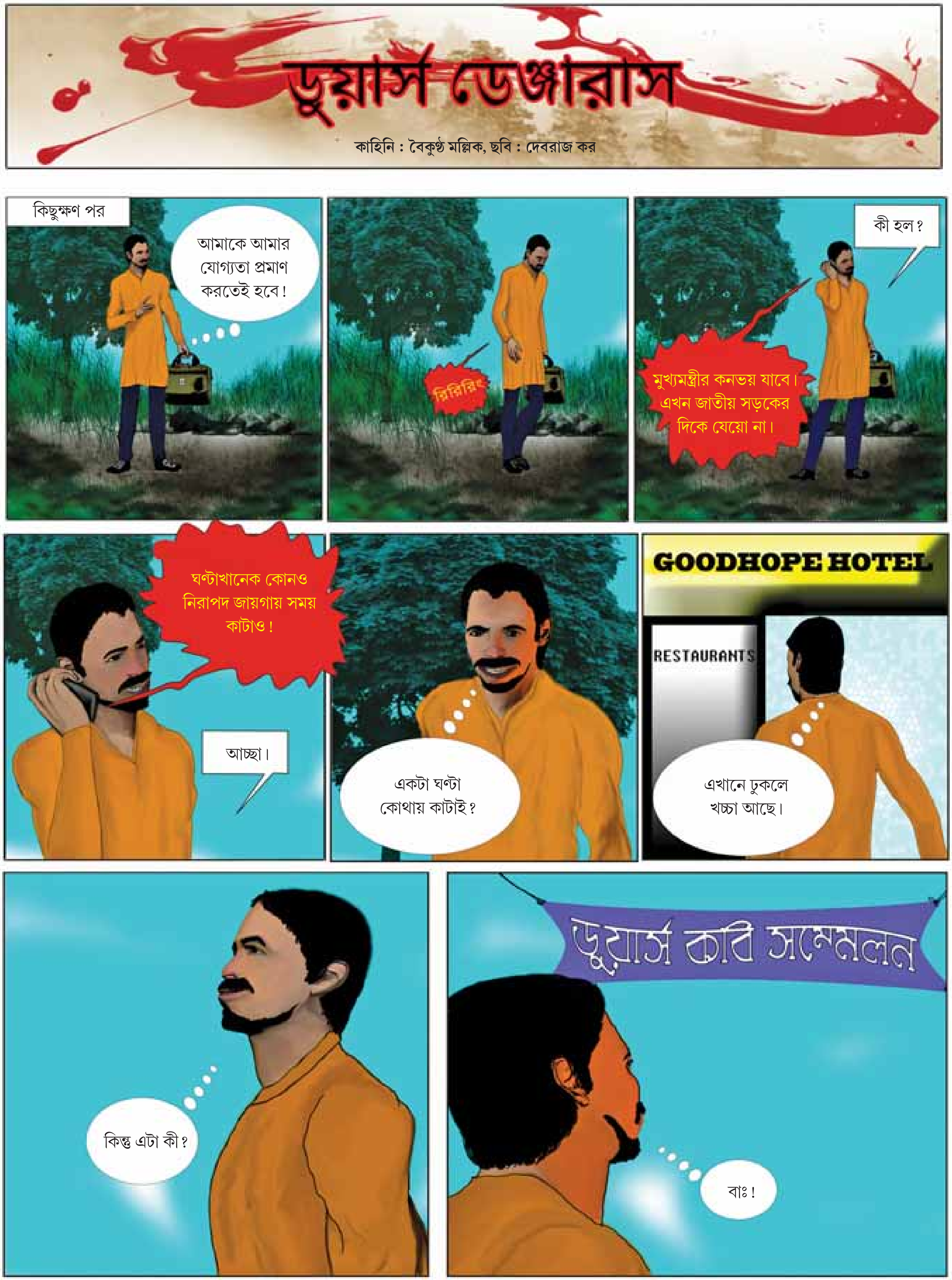

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.